প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠ্যক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠ্যক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

ড. সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়
উপাচার্য

প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল, ২০০৭

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance
of the Distance Education Council, Government of India.

পরিচিতি

বিষয় ঃ ইতিহাস **সাম্মানিক স্তর**

ঃ বিষয় সমিতি ঃ

সপ্তম খ পত্র

পর্যায় ৩-৪

	মূল রচনা	**সম্পাদনা**
একক—১	অধ্যাপিকা প্রীতা ভট্টাচার্য	শ্রী চন্দন বসু
একক—২	ঐ	ঐ

ঘোষণা

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

শ্রী দীপককুমার রায়
নিবন্ধক

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস — ৭ (খ)

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

পর্যায় ৩

একক ৩ পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও রসায়নের উন্মেষ ৭-১৩

একক ৪ পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে নতুন চিন্তাধারার উন্মেষ ১৪-২৩

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

একক 3 ❐ পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও রসায়নের উন্মেষ

গঠন

3.0 প্রস্তাবনা

3.1 বেদোত্তর যুগের কয়েকজন খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ

3.2 আয়ুর্বেদোত্তর হিন্দু চিকিৎসা বিজ্ঞান

3.3 প্রাচীন ভারতের রসায়ন

3.4 উপসংহার

3.5 গ্রন্থপঞ্জী

3.6 প্রশ্নাবলি

3.0 প্রস্তাবনা

প্রাচীন কালে বিজ্ঞানচর্চার দিক থেকে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন ও চিকিৎসাবিদ্যার উল্লেখ প্রমাণ করে যে এই সব ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ একটি অনন্যসাধারণ স্থান অধিকার করেছিল। বলা বাহুল্য যে ভারতবর্ষের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস জানতে যে সব আকরগ্রন্থ পাঠ করা আবশ্যিক হবে তার জন্য সংস্কৃত, আরবি ও পারসিক ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে ধর্মসংস্কারকদের আন্দোলন সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির দিক থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর ধর্মীয় আন্দোলনের ফল শুভ হয়েছিল। বেদের অভ্রান্ততায় সন্দেহ এবং তার বিরুদ্ধ সমালোচনার ফলে স্বাধীন চিন্তার পথ উন্মুক্ত হয় এবং নানা বিষয়ে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের সুযোগ বর্ধিত হয়। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসেও খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মগধের অভ্যুত্থানের পর বিশেষত মৌর্য আমল থেকে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার যে ঊর্ধ্ব গতি পরিলক্ষিত হয় তা পরবর্তীকালে কুষাণ ও গুপ্তসম্রাটদের প্রাধান্যের সময়ে অব্যাহত ছিল। মৌর্য ও গুপ্ত যুগের মাঝামাঝি সময়ে দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত ও ধীরে ধীরে প্রচলিত হয়। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের আবির্ভাবও বিশেষ লক্ষণীয়। গণিতে ও জ্যোতিষে আর্যভট্ট, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত এবং চিকিৎসাবিদ্যায় নাগার্জুন, চরক, দৃঢ়বল ও বাগভট ব্যক্তিগত বৈজ্ঞানিক প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ধর্মীয় আন্দোলন ও রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ছাড়া খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ভারতবর্ষে ও বিভিন্ন

বৈদেশিক রাষ্ট্রের মধ্যে যে ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপিত হয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অগ্রগতিকে তাও কম প্রভাবিত করেনি। এই প্রভাবে উভয়দিকই সক্রিয় হয়েছিল। ভারতীয় গবেষণায় যেমন বৈদেশিক চিন্তাধারার ছাপ পড়েছিল, সেই রকম গ্রীক চৈনিক ও আরব্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপরও ভারতীয় গবেষণা ও চিন্তাধারার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। চিন্তাধারার এই প্রকার আদান-প্রদান বিজ্ঞানের অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য। হেলেনীয় জগৎ ছাড়া রোম, সিংহল, চীন, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশের সঙ্গেও ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। নার্গাজুনকোণ্ডা লিপি ও মিলিন্দা পানহো নামে মিনান্দার রচিত এক বৌদ্ধ গ্রন্থে ভারতের এই বহির্বাণিজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সুযোগ গ্রহণ করেও হিন্দু ও বৌদ্ধ দার্শনিক ও চিকিৎসকগণ এই সময় মাঝে মাঝে যবনদের দেশে গিয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন, চিকিৎসা ও অন্যান্য বিদ্যার কথা প্রচার করতেন। হিন্দু জ্যোতিষের উপর গ্রীক জ্যোতিষের প্রভাব সুস্পষ্ট। গ্রীকদের উন্নততর মুদ্রা-প্রণয়ন পদ্ধতি ও ভারতীয় মুদ্রা শিল্পকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সম্ভবত কিছু কিছু যান্ত্রিক জ্ঞানও এই সময় ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল। এ সম্পর্কে এদেশে জলচাকার (Water mill) প্রবর্তন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। Metrodorus নামক জনৈক গ্রীক এই যন্ত্রটি এদেশে প্রথম প্রবর্তন করেন।

ধর্ম ও দর্শনে চীন ভারত সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রধানত নিবদ্ধ থাকলেও এই সম্পর্কের মারফত বৈজ্ঞানিক ভাবধারারও অল্পবিস্তর আদানপ্রদান ঘটেছিল। ট্যাংদের রাজত্বকালে চীনে কয়েকজন ভারতীয় জ্যোতির্বিদের তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীতে *চ্যাংনানে গৌতম, কাশ্যপ* ও *কুমার* এই তিন রকমের জ্যোতিষীও সিদ্ধান্তের আলোচনা ও চর্চা দেখা যায়। এই তিনটি সিদ্ধান্তই ভারতীয়। ৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী উ-র নির্দেশে গৌতম-সিদ্ধান্তে সুপণ্ডিত জনৈক ভারতীয় জ্যোতির্বিদ একটি পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। সি-তা বা সিদ্ধার্থ নামে আর একজন ভারতীয় জ্যোতির্বিদ অনুরূপ একটি পঞ্জিকা রচনা করেন। ৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে এই পঞ্জিকার নাম *'কিউ-চি-লি'* (নবগ্রহ সিদ্ধান্ত)। তবে, চীন দেশে ভারতীয় জ্যোতির্বিদদের অবস্থান পঞ্জিকা প্রণয়ন ব্যাপারে তাদের তৎপরতা এবং একাধিক হিন্দু জ্যোতিষীর গ্রন্থের চৈনিক তর্জমা ইত্যাদি তথ্য থেকে এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই সময় চৈনিক জ্যোতির্বিদরা ভারতীয় জ্যোতিষে গভীর উৎসাহ ও কৌতূহল প্রকাশ করেছিল এবং হিন্দু জ্যোতির্বিদদের বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখত। ভারতীয় গণিতের ওপর চৈনিক গণিতের প্রভাব একাধিক ঐতিহাসিক প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। পঞ্চম শতাব্দীর ভারতীয় আর্যভট্টর জ্যামিতির সঙ্গে তৃতীয় শতাব্দীর চৈনিক গণিতজ্ঞ লিউ হুই-এর জ্যামিতির অনেক সাদৃশ্য আছে।

গণিত ও জ্যোতিষের মতো হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রেও চৈনিকরা উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে চৈনিক সম্রাটের আদেশে এদেশ থেকে কয়েকজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ও নানাবিধ ভেষজ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে সুয়ান চাও নামে এক সুপণ্ডিত ও সংস্কৃতজ্ঞ চৈনিক পরিব্রাজক ভারতবর্ষে এসেছিলেন। সুয়ানচাও-এর চেষ্টায় সো-পো- মেই নামে এক ভারতীয় চিকিৎসাবিদ ও কিমিয়াবিদ চীন দেশে গিয়েছিলেন। এই সময় ভারতীয়দের ধাতব অস্ত্রের প্রস্তুত প্রণালী ও ব্যবহারজনিত কিছু তথ্য চীন দেশ থেকে পাওয়া যায়।

আরব্য বিজ্ঞানের উৎস ও অনুপ্রেরণা প্রধানত দুটি দেশ থেকে এসেছিল। যথা— গ্রীস ও ভারতবর্ষ। ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগের বহু তথ্য পাওয়া যায়। পারসিক ও সিরিয় পণ্ডিতগণ বরাবরই

ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি সম্ভ্রমশীল ছিলেন; তাদের চেষ্টায় বহু ভারতীয় গ্রন্থ পার্সী ও সিরিয় ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। সপ্তম শতাব্দীতে সেভেরাস্ সেবখ্ত্ নামে এক সিরিয় খ্রীষ্টান ধর্মযাজক হিন্দু অঙ্ক পাতন পদ্ধতির ওপর একটি গ্রন্থ রচনা করে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেন। খলিফা-আল্-মনসুর-এর সময় আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পর ভারতীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে আরব্য পণ্ডিতদের সরাসরি সাক্ষাৎকার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভাবের আদানপ্রদানের আর এক সুযোগ উপস্থিত হয়। ব্রহ্মগুপ্তের '*ব্রহ্মসিদ্ধান্ত*' বা '*সিন্ধহিন্দ*' প্রভৃতি গ্রন্থ এই সময় আরব্য পণ্ডিত মহলে প্রসার লাভ করে। *ইব্রাহিম-আল-ফাজারি* ও *ইয়াকুব্-ইবন্-তারিখ* নামে আরব্য গণিতজ্ঞ হিন্দু পণ্ডিতদের সাহায্যে ব্রহ্মগুপ্তের দুই জ্যোতিষীর গ্রন্থের আরবী তর্জমা প্রণয়ন করেন। আব্বাসীয় খলিফাদের প্রাধান্য কমে যাওয়ার পর আরব ভারত সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ও ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন মুসলমান পণ্ডিত ভারতীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা করেছিলেন। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে আলবিরুনী ভারতবর্ষে এসে মূল সংস্কৃত ভাষায় ভারতীয় গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ন, ভূগোল, পদার্থ বিদ্যা ইত্যাদি অধ্যায়ন করেন এবং এই অধ্যয়নের ফল গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়।

এই সময়কার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিক্ষা ব্যবস্থা তথা বিজ্ঞানচর্চার পীঠস্থান হিসাবে কাজ করত। এই প্রসঙ্গে 'অগ্রহার' গ্রামগুলির শিক্ষাব্যবস্থাও উল্লেখযোগ্য। শিক্ষাব্রতী ব্রাহ্মণরা কোথাও একটি জায়গায় উপনিবেশ স্থাপন করে শিক্ষার্থে আত্মনিয়োগ করত। এই সব গ্রামগুলিকে অগ্রহার গ্রাম বলা হত। কলস তাম্রশাসনে জানা যায়, খ্রীষ্টীয় দশম শতকে রাষ্ট্রকূট নৃপতিগণ কলসগ্রামকে প্রায় ২০০ ব্রাহ্মণের এক উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে দান করেন।

শিক্ষাজগতে *তক্ষশিলার* খ্যাতি ছিল উল্লেখযোগ্য। ষষ্ঠ শতাব্দীতে এটি সমগ্র প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রে তক্ষশিলার অধ্যাপকরা ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। খ্যাতনামা চিকিৎসক আত্রেয় ও জীবক এখানে চিকিৎসাশাস্ত্রে অধ্যাপনা করতেন। *নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়েও* সমস্ত প্রকার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার সুবিধা ছিল। জ্যোতির্বিদ্যা, ও চিকিৎসাবিদ্যায় নালন্দার পণ্ডিতদের প্রত্যেকেই ভারতশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিব্বত, চীন ইত্যাদি দেশ থেকে বহিরাগত ছাত্ররাও এখানে বিজ্ঞান চর্চা করতে আসত। *বিক্রমশীলার* মধ্যদেশে যে কেন্দ্রীয় ভবনটি নির্মিত হয়েছিল, তার নাম '*বিজ্ঞানাগার*'। ৪০০ বছরের উপর বিক্রমশীলার প্রথিতযশা আচার্যগণ এদেশের জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শনচর্চার পথ উন্মুক্ত রেখেছিলেন। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্যতালিকার বিষয়ের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রাধান্য লক্ষণীয়। জ্যোতিষ, সংখ্যা, গণনা, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়গুলি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বিজ্ঞানের তিনটি প্রধান শাখা যথা— জ্যোতিষ, চিকিৎসাবিদ্যা ও রসায়ন চর্চা উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল।

3.1 বেদোত্তর যুগের কয়েকজন খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ

আর্যভট্ট (আনুমানিক ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ প্রাচীনকালের ভারতীয় ও হিন্দু গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অন্যতম হলেন আর্যভট্ট। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হল 'আর্যভটীয়'। এই গ্রন্থের রচনাকাল থেকে আর্যভট্ট-র জন্ম তারিখটিকে ঐতিহাসিকরা চিহ্নিত করেছেন। এই গ্রন্থের রচনাকালের ওপর ভিত্তি করে জানা যায়, আনুমানিক ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পাটলিপুত্রের কাছে কুসুমপুর নামক স্থানে তার জন্ম হয়। বিভিন্ন শতকে আর্যভট্টের গ্রন্থের ওপর নির্ভর করে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার ওপর বহু সমালোচনা ও টীকা রচিত হয়েছে। এর থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, গণিত ও জ্যোতিষ

বিষয়ে আর্যভট্ট প্রদত্ত শিক্ষা ভারতীয় বিদ্বান সমাজে ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

আর্যভট্টের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'আর্যভট্টীয়ম্' একটি ছোট গ্রন্থমাত্র। এই গ্রন্থে মোট ১২৩টি শ্লোক আছে। এটি চারটি প্রধান অধ্যায়ে বিভক্ত। চারটি অধ্যায় হল (ক) দশগীতিকা, (খ) গণিতপাদ (গ) কালক্রিয়া (ঘ) গোলপাদ। দশগীতিকা, কালক্রিয়া ও গোলপাদেই আর্যভট্ট জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে নিজের গবেষণা লিপিবদ্ধ করেছেন। হিন্দু জ্যোতির্বিদদের মধ্যে তিনিই প্রথম পৃথিবীর আহ্নিক গতির কথা উল্লেখ করেন। পৃথিবী কতবার আকর্ষিত হয় তা তিনিই প্রথম নির্ণয় করেছিলেন। তার এই মতামত পরবর্তী হিন্দু জ্যোর্তিবিদদের কাছে তীব্র সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে নামোল্লেখ করা যায় ব্রহ্মগুপ্তের মতো খ্যাতনামা জ্যোর্তিবিদের। বরাহমিহিরও পৃথিবীর আহ্নিকগতির সম্পর্কে প্রকাশিত আর্যভট্টের মতের বিরোধী ছিলেন।

আর্যভট্টের কয়েকজন শিষ্য ছিলেন, যারা গুরুর মতোই টীকাকার হিসাবে জ্যোতিষে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, লাটদেব, প্রথম ভাষ্কর, লল্লর প্রমুখ। লাটদেব আর্যভট্টের কাছে জ্যোতির্বিদ্যা শিখে রোমক ও পৌলিশ জ্যোতিষ সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা রচনা করেন। আলবিরুনীর মতে, লাটদেবই বিখ্যাত 'সূর্যসিদ্ধান্ত'-এর রচনাকার। কিন্তু, বরাহমিহিরের রচনা থেকে জানা যায়, লাটদেব একজন টীকীকার ছিলেন মাত্র, জ্যোতির্বিদ নন।

বরাহমিহির (অঅনুমানিক ৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে) ঃ রোমান ঐতিহাসিক প্লিনির সাথে বরাহমিহিরের তুলনা করা হয়। তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার ছিল 'বিশ্বকোষ'-এর মতো। প্রাচীন ভারতের হিন্দুদের বিজ্ঞান, মূলত জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারা সম্পর্কিত তার গ্রন্থাবলী বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। উজ্জয়িনী ছিল তার কর্মক্ষেত্র। ৫০৫ খ্রীষ্টাব্দের সময়কে তার কার্যকলাপের কাল হিসাবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি।

বরাহমিহিরের শ্রেষ্ট জ্যোতিষ গ্রন্থ হল 'প সিদ্ধান্তিকা' বরাহমিহিরের আগে অনেক হিন্দু জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তাদের কার্যকলাপের বিবরণ পাই আমরা বরাহমিহিরের রচনা থেকে। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত জ্যোতিষীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— সিংহাচার্য, প্রদ্যুন্ন, বিজয় নন্দী প্রমুখ। আর্যভট্ট ও লাটদেবের নাম পূর্বেই উল্লেখ্য, বরাহমিহিরের রচনা থেকে জানা যায়, প্রদ্যুম্ন মঙ্গল ও শনি গ্রহের গতি পর্যবেক্ষণ করতেন, বিজয় নন্দী বুধ গ্রহের গতি পর্যবেক্ষণ করতেন। এরা সকলেই আর্যভট্ট পূর্ব যুগের।

ব্রহ্মগুপ্ত (জন্ম ৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে) ঃ আর্যভট্ট-র পর প্রাচীন ভারতে গণিত ও জ্যোতিষে যিনি নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি হলেন, ব্রহ্মগুপ্ত। আর্যভট্টের আহ্নিক গতির মতাদর্শকে তিনি গ্রহণ করেন নি। তিনি গ্রহণ সম্পর্কিত পুরানের রাহু-কেতুর ব্যাখ্যাটিকেই পুনর্জীবিত করেন। এর পাশাপাশি, তিনি আর্যভট্টর ওপরও তীব্র আক্রমণ চালান, ব্যক্তিগতভাবে। অনেকে তো মনে করেন, আর্যভট্টের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি তাকে ঈর্ষান্বিত করে তোলে। তার শিক্ষা ও উপদেশের গভীর প্রভাবের কারণে তিনি এই ধরনের সমালোচনায় লিপ্ত হন।

মুঞ্জাল (খ্রীষ্টীয় নবম শতক) ঃ খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর অন্য আর এক প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ হিসাবে মুঞ্জাল-এর নাম করা যায়। মুঞ্জালের জন্মস্থান বা জন্ম তারিখ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে, তার কর্মস্থল ছিল উজ্জয়িনী। এ প্রসঙ্গে সুধাকর ত্রিবেদী দেখিয়েছেন যে, মুঞ্জাল আনুমানিক ৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে 'লঘুমানস' নামে একটি জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করেন।

ভারতীয় জ্যোতিষে অয়ন-চলন (বা পৃথিবীর পরিক্রমন) তার বেগ সম্পর্কে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন মুঞ্জাল। তবে তিনিই যে এর প্রবক্তা তা নিয়ে সঠিক কোনো প্রমাণ নেই। তবে, তার আগে অন্য কোনো জ্যোতির্বিদের এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে আলোচনা দেখা যায় না। জ্যোতির্বিদ ভাস্কর অয়নগতির বিষয়ে বর্ণনাকালে মুঞ্জালের নামোল্লেখ করেছেন। তিনি হুবহু মুঞ্জালকে অনুকরণও করেছেন।

ভাস্কর (জন্ম ১১১৪ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ হিসাবে ভাস্করের নাম উল্লেখ্য। ভাস্কর ব্যাস-গণিতের সাহায্যে 'তৎকালিক গতি'র মূলতত্ত্ব প্রয়োগ করেন। এই তত্ত্বটির ব্যাখ্যাকার ও প্রমাণ করেন স্বর্গীয় বাসুদেব শাস্ত্রী। ভাস্করের পূর্ববর্তী হিন্দু জ্যোতির্বিদরা পর পর দুদিন একই সময়ে কোনো গ্রহের দেশান্তর নির্ণয় করার মাধ্যমে তাদের দৈনিক গতি নির্ণয় করতেন। ভাস্কর এই গতিকে 'স্থূলগতি' বলে উল্লেখ করেছেন। স্থূলগতির পরিবর্তে সূক্ষ্মগতি নির্ণয়ের জন্য তিনি 'তৎকালিকগতি'র পরিকল্পনা করেন। এই গতি নির্ণয়ের জন্য তিনি ব্যাস-গণিতের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন।

সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ ঃ সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ রচিত হয় আনুমানিক ১০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ-এর মধ্যে। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ রচনার কালে একদল বহিরাগত জ্যোতির্বিদের উল্লেখ পাই। এরা মূলত ছিলেন শকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ। এরা ক্রমে ভারতীয় ব্রাহ্মণদের সাথে মিলে যায়। এই সময় ভারতীয় পণ্ডিতরা গ্রীক রাজসভায় এবং গ্রীক পণ্ডিতদের ভারতীয় রাজসভায় উপস্থিতির নিদর্শন পাওয়া যায়। এই ঘটনাবলীর ছাপ পাওয়া গেছে পুলিশ-রোমক সিদ্ধান্তে। বিশেষত গ্রীক জ্যোতিষের ছাপ এই সিদ্ধান্তে ব্যাপক। তবে, এই বিদেশী ভাবধারাকে ভারতীয় হিন্দুরা গ্রহণ করেননি। বিদেশী জ্যোতির্বিদদের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখেই তারা তাদের অবদানকে চিহ্নিত করেছেন।

'সিদ্ধান্ত' বলতে কেবলমাত্র জ্যোতিষ গ্রন্থাবলী নয়। যেকোনো জ্যোতিষ গ্রন্থকেই হিন্দু জ্যোতির্বিদরা 'সিদ্ধান্ত' বলে অভিহিত করেন। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ ও টীকাকারদের রচনা থেকে মূলত আঠারো ধরনের সিদ্ধান্তের সন্ধান পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ্য পুলিশ বা পৌলিশ সিদ্ধান্তের কথা। বরাহমিহিরের পাশাপাশি টীকাকার ভট্টোৎপল এই সিদ্ধান্তের আলোচনা করেছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, এক মহাযুগ অর্থাৎ ৪,৩২০,০০০ সৌর বৎসরে ১,৫৭৭,৯১৭,৮০০ দিন হয়। এর ফলে বৎসর সংখ্যা ৩৬৫.২৫৮ দিন। বর্তমানে বুধ, চাঁদ, পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহের পরিক্রমণের সময়কাল নিজ নিজ আবর্তন গতির ওপর নির্ভর করে নির্ণয় করা হয়। এভাবেই পৃথিবীর পরিক্রমণকাল ৩৬৫.২৫৮৭৫ দিন, চাঁদের ২৭.৩২১৬৭ দিন, মঙ্গলের ৬৮৬.৯৯৭৫ দিন নির্ণয় করা হয়। কিন্তু বর্তমান এই পদ্ধতিতে জ্যোতির্বিদরা গণনা করতেন না। তারা প্রথমে একটি নির্দিষ্টকাল নির্ণয় করত। সেই সময়কালে গ্রহগুলি পৃথিবীকে কতবার প্রদক্ষিণ করত তাও নির্ণয় করতেন। তবে, ঐ নির্দিষ্ট সময়কালটিকে এমনভাবে নির্ণয় করা হত যে, গ্রহগুলির পরিক্রমণ সময় একটি পূর্ণ সংখ্যায় পাওয়া যেত।

বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল সূর্য সিদ্ধান্ত। প্রচলিত সূর্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে সর্বপ্রথম লিখিত সূর্য সিদ্ধান্তে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। বর্তমান সূর্য সিদ্ধান্তটি বহু জ্যোতির্বিদ, টীকাকারদের দ্বারা পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত হয়েছে। এই পরিবর্তনটি মূলত প্রাক-পঞ্চম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে সাধিত হয়। বর্তমান সূর্য সিদ্ধান্তটি ১৪টি পরিচ্ছেদে রচিত। যথা—(১) গ্রহদের মধ্যে গতি (২) গ্রহদের প্রকৃত অবস্থান (৩) দিক, (৪) দেশ (৫) কাল (৬) চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ (৭) গ্রহদের সংযোগ (৮) ও (৯) নক্ষত্র (১০) চাঁদের উদয় অস্তের উচ্চতা (১১) সূর্য

ও চন্দ্রের কয়েকটি দোষ (১২) ব্রহ্মলোক, ভূগোল সৃষ্টির ব্যাপ্তি (১৩) আর্মিলারী গোলক ও কয়েকটি জ্যোতিষীয় যন্ত্রপাতি (১৪) কাল নির্ণয়ের বিভিন্ন উপায়।

আধুনিক ইউরোপীয় জ্যোতিষীয় তালিকাগুলিতে গ্রহ-নক্ষত্রদের পর্যায়কাল ও তাদের পরিক্রমণকে সৌর দিনে প্রকাশ করার রীতি প্রচলিত আছে। সূর্য সিদ্ধান্তের সারণী অনুসারে, এই পরিবর্তনকে আধুনিক ইওরোপীয় তালিকার সাথে মেলালেই বোঝা যাবে হিন্দু জ্যোতির্বিদরা প্রাচীনকালে কিভাবে এই সব তথ্য নির্ণয় করেছিলেন। সূর্য সিদ্ধান্তে পৃথিবীর ব্যাসের মাপ হল ১৬০০ যোজন। অর্থাৎ ৮০০ যোজনকে দ্বিগুণ করলে পাওয়া যাবে পৃথিবীর ব্যাস এবং পৃথিবীর ব্যাসকে বর্গ করে তাকে ১০ দিয়ে গুণ করলে সেই গুণফলের বর্গমূলই হবে পৃথিবীর পরিধি। ইরাটস্থেনিস-এর পদ্ধতিতেই হিন্দুরা পৃথিবীর ব্যাস নির্ণয় করেন। এই পদ্ধতি হল— একই মধ্যরেখার ওপর দুই বা ততোধিক স্থানে ঠিক মধ্যাহ্নের সময় সূর্য যখন মাথার ওপর থাকে তখন উন্মুক্ত স্থানে একটি দণ্ডের ছায়া পর্যবেক্ষণ করে পৃথিবীর উপর পতিত সূর্যরশ্মি তির্যকতার পার্থক্য করা যায়। সূর্যরশ্মির পতন কোণ, তার তির্যকতার কৌনিক পার্থক্য ও স্থান দুটির দূরত্ব জানা থাকলে সহজেই পৃথিবীর ব্যাস নির্ণয় করা যায়।

হিন্দু জ্যোতির্বিদরা চাঁদের লম্বের সাথে পরিচিত ছিলেন। সূর্যসিদ্ধান্তে চন্দ্রের লম্বের মাপ ছিল ৫৩.৬৮১। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের নির্ণয় করা যায় ত্রিকোণমিতির সূত্র অবলম্বন করে। এই দূরত্ব আবার চাঁদের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ। তাই পৃথিবী ও চাঁদের দূরত্ব নির্ণয়ের সাথে সাথেই আমরা চাঁদের কক্ষপথের পরিধি নির্ণয় করতে পারব। এইভাবে প্রাচীন জ্যোতির্বিদরা পৃথিবী চন্দ্রের দূরত্ব নির্ণয় করেছেন ৫১,৫৬৬ যোজন এবং চাঁদের কক্ষপথের পরিধি নির্ণয় করেছেন ৩২৪,০০০ যোজন। চাঁদ পৃথিবীর নিকটবর্তী হওয়ায় এর লম্ব যত সহজে মাপা যায় অন্যান্য দূরবর্তী গ্রহগুলির লম্ব সহজে মাপা যায় না। এদের লম্বের দূরত্ব এত ছোট যে, সে যুগে তা নির্ণয় করা সহজ ছিল না। হিন্দুরা মনে করেন যে, বিভিন্ন কক্ষপথে আবর্তিত গ্রহদের গতিবেগ সমান। অর্থাৎ চাঁদ যে বেগে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, দূরবর্তী শনিগ্রহও ঐ একই বেগে পৃথিবীকে পরিক্রমণ করছে। শনিকক্ষের পরিধি কক্ষের পরিধির থেকে বেশি হওয়ায় শনির ভগনকাল চাঁদের থেকে বেশি। তবে এই সিদ্ধান্ত আর গ্রহণযোগ্য নয়। কেপলারের সূত্রগুলি আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত জ্যোতির্বিদরা এই ধারণাই পোষণ করত যে, একটি গ্রহের বেগ জানা থাকলে অন্যগুলির সাথে গ্রহের নক্ষত্রকে ভগনকাল দ্বারা গুণ করলে কক্ষের পরিধি বের করা যাবে।

গ্রহরা নিজ নিজ কক্ষে সমান বেগে আবর্তিত হলে পৃথিবী থেকে তাদের গতি ও আকাশে অবস্থানকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায় না। এই গতির নানারকম প্রকার ভেদ লক্ষ্য করা যায়। ব্যবিলন ও গ্রীক জ্যোতির্বিদরা গ্রহদের এই বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। পৃথিবীর পরিক্রমণের সময় গ্রহগুলির গতি কখনও কম, কখনও বেশি আবার কখনও দিক পরিবর্তিত হয়। ভারতীয় হিন্দু জ্যোতির্বিদরাও এ বিষয়টিকে লক্ষ করেছিলেন। সূর্য সিদ্ধান্তের মতে, গ্রহের গতি আট প্রকার। যথা— বক্র, অনুবক্র, কুটিল, মন্দ, সম মন্দতর, অতিশীঘ্র ও শীঘ্র। আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্তের মতো ভারতীয় জ্যোতির্বিদরা আটপ্রকার গতির উল্লেখ করেছেন। গ্রীক জ্যোতির্বিদরা গ্রহদের গতিবৈষম্যের ব্যাখ্যা দেন। বৃত্ত ও পরিবৃত্তের সাহায্যে।

গ্রীকদের মতো ভারতীয়দের গ্রহের গতি নির্ণয় পদ্ধতি ছিল বৃত্ত ও পরিবৃত্তের সাহায্যে। হিন্দু জ্যোতিষে গ্রহদের গতিকে বোঝাতে আর্যভট্ট দুই প্রকার বৃত্তের ব্যবহার করেছেন। তবে, সূর্যসিদ্ধান্তে যে পরিবৃত্তের ব্যবহার

আছে তা আর্যভট্টই সংযোজন করেন বলে মনে করা হয়। আধুনিক সূর্য সিদ্ধান্তে সেগুলি আর্যভট্টর থেকেও প্রাচীন বলে মনে হয়, তাতে পরিবৃত্তের কোনো উল্লেখ নেই। প্রাক আর্যভট্টীয় সিদ্ধান্ত জ্যোতিষে মনে করা হত যে, গ্রহরাই ভূকেন্দ্রীয় বৃত্তপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।

অয়নাংশ সম্পর্কে যে হিন্দুরা জ্ঞানী ছিলেন এ কথার নিশ্চয়তা নেই। কোনো কোনো পণ্ডিত বৈদিক হিন্দু জ্যোতির্বিদদের এই তথ্যের সালে পরিচিত ছিলেন। বার্গেস দেখিয়েছেন যে,— বিখ্যাত প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্বিদরা এমনকী ব্রহ্মগুপ্তও তাদের গ্রন্থে এই অয়নাংশ বা পরিভ্রমণের উল্লেখ বা আলোচনা করেননি। তারা হয়ত এ ব্যাপারে জানতেন না, বা জানলেও এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। হিন্দু জ্যোতির্বিদ্‌গণের মধ্যে ষষ্ঠ শতকে বিষ্ণুচন্দ্র ও তার কিছু পরে শ্রীসেন প্রথম অয়ন চলনের উল্লেখ করেন। তবে, অয়ন চলনের গুরুত্ব এদেশে সম্ভবত মুঞ্জালই প্রথম উপলব্ধি করেন।

মুসলমান জ্যোতির্বিদরাও এই অয়নের দোলন গতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। নবম শতাব্দীতে থাবিত ইবন কুরা অয়নের দোলন গতির আলোচনা করেন এবং মুসলিম বিজ্ঞানীগণ এই মতবাদ গ্রহণ করেন। এই দোলনগতির কথা মধ্যযুগে ল্যাটিন ইওরোপীয় জ্যোতির্বিদরা আরব্য বিজ্ঞানীদের কাছ থেকেই জানেন। এক সময় ইওরোপেও এই মতবাদ বিশেষ প্রাধান্য পায়। অয়নাংশ সম্পর্কে হিন্দুদেরও নির্ভুল গণনা দেখা যায়। হিপার্কাস্ অয়নাংশের মাত্রা তারা মেপে বের করেন ৩৬″ সেকেন্ড। অ্যালমাজেস্টে টলেমী এই মানই গ্রহণ করেন।

3.2 আয়ুর্বেদোত্তর হিন্দু চিকিৎসা বিজ্ঞান

হিন্দু চিকিৎসা বিজ্ঞানে আয়ুর্বেদের যুগ হল সুবর্ণযুগ। এই সময় হিন্দু চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে, বহু চিকিৎসা বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু এই উন্নতি হয়েছে আয়ুর্বেদের কারণে।

নাগার্জুন (১ম, ২য়, ৯ম শতক?) ঃ প্রাচীন ভারতের আয়ুর্বেদ গ্রন্থ 'সুশ্রুত সংহিতা'কে পরিমার্জিত ও সংশোধিত করেন নাগার্জুন। প্রাচীন ভারতে তিনজন নাগার্জুনের কথা জানা যায়। প্রথম নাগার্জুন হলেন, মাধ্যমিক-সূত্রবৃত্তির রচয়িতা শূন্যবাদী বৌদ্ধ নাগার্জুন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক ছিল তার কার্যকাল। তবে, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে রচিত 'রাজতরঙ্গিনী'তে উল্লিখিত নাগার্জুনের কার্যকাল ছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকের শেষভাগ ও তৃতীয় শতকের প্রথমভাগে।

চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে বৃন্দ উল্লিখিত 'সিদ্ধযোগে' এক নাগার্জুনের কথা বলা হয়েছে। অনেকে মনে করেন এই চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের নাগার্জুনই 'সুশ্রুত সংহিতা'র রচয়িতা। তিনিই মূল গ্রন্থের কিছু কিছু পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করেন। সুশ্রুত চন্দ্রিকা ও ন্যায়চন্দ্রিকা নামে প্রচলিত গয়দাসের পঞ্জিকাতে নাগার্জুন পাঠ নামে উল্লিখিত পাঠটি সুশ্রুতসংহিতারই পাঠ।

তৃতীয় নাগার্জুনকে অষ্টম বা নবম শতাব্দীর বলে মনে করা হয়। 'লোহাশাস্ত্র', 'কলপুটতন্ত্র', 'রসরত্নাকার', 'আরোগ্যমঞ্জরী' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা এই তৃতীয় নাগার্জুন। তিনি ছিলেন গুর্জরের রাসায়নিক বা কিমিয়াবিদ। ধাতুবিদ্যা, পারদ সম্পর্কিত যৌগিক জ্ঞান ও নানারকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি মৌলিক গবেষণা করেছেন।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এ বিষয়ে তার অবদান অপরিসীম। আলবিরুণী এই রসায়নবিদ সম্পর্কে লিখেছেন,— ''এই বিদ্যার (কিমিয়া) একজন বিখ্যাত প্রতিভূ হলেন সোমনাথের নিকটবর্তী দাইহকের অধিবাসী নাগার্জুন। তিনি এই বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং এর সমস্ত দিক আলোচনা করে যে মৌলিক গ্রন্থটি প্রকাশ করেন, তা এখন দুষ্প্রাপ্য। আমাদের একশ বছর আগে তিনি জীবিত ছিলেন।''

নাগার্জুন নামধারী এই সমস্ত ব্যক্তিরাই ভিন্ন ছিলেন, না সর্বশাস্ত্রজ্ঞ কেবল একজনই ছিলেন তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লিখেছেন,— সুশ্রুতের নাগার্জুন, লোহাশাস্ত্রের নাগার্জুন এবং মাধ্যমিক সূত্রাবৃত্তির নাগার্জুন সকলেই সম্ভবত একই ব্যক্তি ছিলেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় বাগভট্ট (৭ম ও ৯ম শতাব্দীর) ঃ প্রথম বা বৃদ্ধ বাগভট্টের বিখ্যাত গ্রন্থটি হল 'অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ'। আত্রেয়, সুশ্রুত ও চরক সংহিতার পরই এই গ্রন্থটির স্থান। পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলির মতোই 'অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ' ও একটি চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ, যা বহু শতাব্দী ধরে ভারতে সমাদৃত। বাগভট্ট ছিলেন প্রাচীন ভারতের 'বৃদ্ধ ত্রয়ী'র একজন। অপর দু'জন হলেন— আত্রেয় ও সুশ্রুত। তবে, বাগভট্টের প্রাচীনত্ব নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। তবে, তিনি যে আত্রেয়, সুশ্রুত এর পরবর্তী সে নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ডঃ হোয়েনলে তাকে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের লোক বলে বর্ণনা করেছেন। ডঃ সার্টনও এই মত গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইৎসিং-এর নামোল্লেখ করা যায়। তার গ্রন্থেও বাগভট্টের অষ্টাঙ্গ সংগ্রহের উল্লেখ করেছেন। ইৎসিৎ ৬৭৫ থেকে ৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। বাগভট্টের গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি বলেন,— প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র বিশেষত আয়ুর্বেদ আটটি ভাগে বিভক্ত ছিল। কিন্তু একজন চিকিৎসাবিদ এই আটটি গ্রন্থকে একত্র করে রচনা করেছেন। ভারতের সমস্ত চিকিৎসকই এই গ্রন্থ অনুসারে চিকিৎসা করেন। এর থেকে মনে হয়, ঐ চিকিৎসক বাগভট্ট ছাড়া কেউ নন।

দ্বিতীয় বাগভট্ট ছিলেন সিন্ধু অধিবাসী সিংহগুপ্তের পুত্র। চিকিৎসক ও গ্রন্থকার হিসাবে খ্যাতি ছিল। তার গ্রন্থের নাম ছিল 'অষ্টাঙ্গ-হৃদয়-সংহিতা'। এই গ্রন্থটি মূলত বৃদ্ধ বাগভট্টের 'অষ্টাঙ্গ'-সংগ্রহ অনুসারে শ্লোক হিসাবে রচিত। জনপ্রিয়তার দিক থেকে এই গ্রন্থটি বৃদ্ধ বাগভট্টের গ্রন্থকেও ছাড়িয়ে যায়। দুই বাগভট্টের গ্রন্থ পাঠ করে মনে হয়, চরক ও সুশ্রুতের সময় শল্যচিকিৎসা ও শারীর চিকিৎসার যে উন্নতি ঘটেছিল, তার বাগভট্টদ্বয়ের সময় অবনতি ঘটে। সুশ্রুতের গ্রন্থে নরকঙ্কালের যে নিখুঁত বিবরণ আছে, বাগভট্টের গ্রন্থে তার অসংলগ্ন, সামঞ্জস্য হীন, আবার কোনো বিষয় একেবারেই অনুপস্থিত। এতে বোঝা যায়, এই সময় শল্যচিকিৎসার চর্চা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বাগভট্টের সময় অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। সুশ্রুতে নানা রকম চক্ষুরোগ এবং তার অস্ত্র চিকিৎসা সম্পর্কে বিশদ উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে সুশ্রুতের টীকাকার দ্বিতীয় সুশ্রুত ও তার 'উত্তরতন্ত্রে' এই রোগ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু অষ্টাঙ্গ সংগ্রহের আলোচনা অনেক নিকৃষ্ট। দ্বিতীয় বাগভট্টের রচনায় চক্ষুরোগের অস্ত্র চিকিৎসা বিষয়ে আলোচনা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। এর কারণ হিসাবে বৌদ্ধদের অহিংসনীতিকে দায়ী করা হয়েছে।

মাধবকর ও বৃন্দ (খ্রীষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতক) ঃ ইন্দুকরের পুত্র মাধবকর ছিলেন 'বুগ্বিনিশ্চয় মাধব নিদানে'র রচয়িতা। খ্রীষ্টীয় অষ্টম অথবা নবম শতকে তাঁর কার্যকাল ছিল। সুচিকিৎসক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। গণ্ডালের ঠাকুর সাহেব প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, বেদের প্রসিদ্ধ টীকাকার সায়নাচার্যের ভাই মাধবাচার্য ও এই মাধবকর একই ব্যক্তি ছিলেন। এই সময়েই বৃন্দ নামে এক চিকিৎসক ও রসায়নবিদের নাম পাওয়া যায়। তিনি

'সিদ্ধযোগ' নামক চিকিৎসাগ্রন্থের রচয়িতা।

চক্রপানি দত্ত (একাদশ শতাব্দী) ঃ বাংলাদেশের বৈদ্য ও রসায়নিক চক্রপানি দত্ত 'চিকিৎসা সার সংগ্রহে'-র রচয়িতা। এ প্রসঙ্গে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,— 'নরপাল দেবের রাজত্বকালে বৈদ্যজাতির প্রচুর উন্নতি হয়েছিল।' উল্লিখিত গ্রন্থটি হিন্দু চিকিৎসা ও নানারকম ওষুধের একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এটি বৃন্দের 'সিদ্ধযোগ'-এর অনুকরণে রচিত। চক্রপানি দত্ত সুশ্রুত সংহিতার ওপর 'ভানুমতী' নামে একটি টীকা ও চরক সংহিতার ওপর 'চক্রতত্ত্বদীপিকা' নামে একটি টীকা রচনা করেন। চক্রদত্তের 'মুক্তাবলী' ওষুধ সম্পর্কে একটি বহু প্রচলিত গ্রন্থ, রসায়নবিদ হিসাবে চক্রপানি দত্তের বিশেষ খ্যাতি ছিল। পারদ-গন্ধক ঘটিত লবণ বা মারকারি সালফাইড কজ্জলী বা রসকর্পটি সম্ভবত তিনিই আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কার সম্বন্ধে বৃন্দের নামও কিছু অংশে উল্লেখের দাবি রাখে। সম্ভবত চক্রপানিই প্রথম ওষুধ হিসাবে কজ্জলীর ব্যবহার করেন।

ডল্হন (১১শ কিংবা ১২শ শতক) ঃ ডল্হনের 'নিবন্ধ সংগ্রহ' হল সুশ্রুত সংহিতার একটি টীকা বিশেষ। চক্রপানি দত্তের পর তিনিই সুশ্রুতের অন্যতম প্রাচীন টীকাকার। এই গ্রন্থে তিনি বলেন, বৃদ্ধ সুশ্রুত রচিত সুশ্রুত সংহিতা নাগার্জুনের দ্বারা পরিমার্জিত হয়ে বর্তমান সুশ্রুত সংহিতার আকারে প্রকাশ পেয়েছে।

শার্ঙ্গধর (১৩শ শতক) ঃ শার্ঙ্গধর মধ্যযুগের পশ্চিম ভারতীয় চিকিৎসক ও রসায়নবিদদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। তাঁর কার্যকাল ১৩শ শতক। কারণ, এই শতকের শেষে বোপদেব নামক এক চিকিৎসাশাস্ত্রে টীকাকার শার্ঙ্গধরের সংহিতার ওপর একটি টীকা রচনা করেছেন। 'শার্ঙ্গধর সংহিতা' তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। (১) প্রথম খণ্ডে ভারতীয় ওজন ও মাপজোখের নানা ব্যবস্থা, ওষুধের গুণাগুণ, রোগ নির্ণয়, রোগের প্রকারভেদ ও শ্রেণীবিন্যাস, রোগের ওপর ঋতুর প্রভাব, অ্যানাটমি ও শারীর বৃত্তীয় নানা বিষয় আলোচিত হয়েছে। (২) দ্বিতীয় খণ্ডে, কষায়, নিষেক, বড়ি, চূর্ণ প্রভৃতি প্রস্তুত প্রণালী, স্বর্ণভস্ম, ধাতবভস্ম, পারদ ঘটিত যৌগিক প্রস্তুত প্রণালী আলোচিত হয়েছে। (৩) সাধারণভাবে, চিকিৎসার নিয়মবিধি তৃতীয় খণ্ডে আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থটিতে নাড়ী পরীক্ষার পদ্ধতির বিস্তৃত বিশ্লেষণ আছে। অন্যান্য চিকিৎসাশাস্ত্রের থেকে শার্ঙ্গধর সংহিতায় রোগের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁর লেখাতেই প্রথম অহিফেন সম্পর্কে জানা যায়। ব্যবহারও প্রথম তিনিই করেন। অকরাকভ নামক লালা উৎপাদক ও উত্তেজক ভেষজের গুণাগুণ সম্পর্কেও এক আলোচনা এতে আছে।

শার্ঙ্গধর সংহিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল— এই গ্রন্থে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রণের সাহায্যে ওষুধ তৈরির প্রক্রিয়ার বর্ণনা আছে। এই রাসায়নিক মিশ্রণের জন্য ব্যবহৃত হতো ধাতব, পারদ বা আর্সেনিক ঘটিত ওষুধ। শার্ঙ্গধরের আগে চক্রপানি, নাগার্জুন, বৃন্দ, বাগভট্ট, এরা এই ধাতব যৌগিক পদার্থ দ্বারা ওষুধ তৈরির কথা বলেছেন। এই সমস্ত গ্রন্থ থেকে শার্ঙ্গধর সংহিতার প্রধান উপকরণ গৃহীত।

ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে ধাতব যৌগিক ও পারদ ঘটিত লবণের ব্যবহার সম্পর্কে প্রথম তৎপরতা দেখা যায় ষোড়শ শতকে, প্যারাসেলসাস (১৪৯৩-১৫৪১) নাম এক উদ্যোগী ব্যক্তির মধ্যে। প্যারাসেলসাসের আগেই যে ভারতীয় বৈদ্যরা এ বিষয়ে জানতেন এর থেকে তা উপলব্ধি করা যায়। অধ্যাপক সার্টন এ বিষয়টি স্বীকার করলেও ভারতীয় হিন্দু বৈদ্যদের স্বকীয়তা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিমিয়া ও ওষুধ হিসাবে নানা রাসায়নিক দ্রব্য

ব্যবহারের বিষয়ে হিন্দুরা ল্যাটিন ইউরোপীয়দের অনেক আগে থেকে গবেষণায় রত হলেও এই চেষ্টা যে আরব্য ও চৈনিক কিমিয়াবিদদের আগে ঘটেনি তা সার্টন বলতে চেয়েছেন।

কিমিয়াশাস্ত্রে ভারতীয় হিন্দু ও আরব মুসলিম বিজ্ঞানী জ্ঞান সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, চরক ও সুশ্রুতসংহিতা, দ্বিতীয় বাগভট্টর অষ্টাঙ্গ-হৃদয়-সংহিতা, বা মাধবকরের নিদান প্রভৃতি গ্রন্থগুলি আরবীয় কিমিয়া সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের আগে আরব ভাষায় প্রকাশিত হয়। 'তালীফ শারীফ'-এর গ্রন্থকার এ বিষয়ে লেখেন,— সুমবুলখার নামে আর্সেনিক ঘটিত ওষুধটি হিন্দু চিকিৎসকরা বিনা দ্বিধায় বিশেষ ক্ষেত্রে রোগীকে দিয়ে দিতেন। কিন্তু ইউনানি চিকিৎসকরা তা দেন না, তাদের মতে এটি ক্ষতিকারক। ভারতীয় চিকিৎসকরা লোহা ঘটিত ওষুধ হামেশা রোগীকে দেন কিন্তু ইউনানি চিকিৎসকরা এই ওষুধ প্রদানে বিরত থাকেন।

নরহরি ঃ ত্রয়োদশ শতকের আর একজন সুচিকিৎসক ও বৈয়াকরণ হলেন নরহরি। ১২৩৫-৫০ সালের মধ্যে তিনি 'রাজনিখন্টু' বা 'অভিধান চূড়ামণি' নামে ভেষজদ্রব্য দ্বারা চিকিৎসার একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রাচীন ভারতের রসায়ন ঃ দুটি আলাদা আলাদা সূত্র থেকে রসায়নের উদ্ভব। যথা— (১) মৃৎশিল্প, কাঁচ শিল্প, ধাতু শিল্প সংক্রান্ত কারিগরি বিদ্যা (২) চিকিৎসাবিদ্যা। ভারতবর্ষে এই দুটি বিদ্যাই অত্যন্ত প্রাচীন। তাই বলা যায় ভারতের রসায়ন বিদ্যাও প্রাচীন। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার মৃৎশিল্পীরাই হলেন প্রাচীন ভারতের প্রথম রাসায়নিক। এরপরই আসে আয়ুর্বেদ যুগ। ফলে চিকিৎসা শাস্ত্রের সাথে ওতপ্রোতঃ ভাবে জড়িত হল রসায়ন। রসায়নের উন্নতি ঘটতে লাগল, শাস্ত্রের অনুষঙ্গ হিসাবে। চিকিৎসাবিদ্যাকে অবলম্বন করেই হিন্দুদের রসায়নজ্ঞান ধীরে ধীরে উন্নত হতে থাকে।

চরক ও সুশ্রুতের রসায়ন ঃ চরক ও সুশ্রুত উভয়েই সোনা, রূপা, তামা, সিসা, টিন, লোহা এই ছটি ধাতুর সাহায্যে কয়েকপ্রকার ক্ষার, লবণ ও পানীয় ও কয়েকটি রাসায়নিক তৈরি করতেন। অর্থাৎ মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ সম্পর্কে তাঁদের স্পষ্ট জ্ঞান ছিল। তাঁরা জানতেন যে, এই মৌলিক পদার্থের উৎস ছিল পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।

লবণ ঃ চরক পাঁচপ্রকার লবণের উল্লেখ করেছেন। যথা— সৌবর্চল বা শোরা, সৈন্ধব বা খনিজ লবণ, বিট বা কৃষ্ণ লবণ, সামুদ্র বা সামুদ্রিক লবণ এবং উদ্ভিদ বা উদ্ভিজ্জলবণ। তুঁতে, মোমছাল, হরিতাল, গন্ধক প্রভৃতিতেও খনিজ লবণ আছে। চামড়ার রোগের জন্য ভেষজের সাথে এসব খনিজ লবণ মিশিয়ে ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন চরক।

ক্ষার ঃ ক্ষার ও তার তৈরির পদ্ধতি চরক ও সুশ্রুত সংহিতায় বিশদে উল্লেখ আছে। যথা— ''পলাশের নতুন অংশটিকে প্রথমে টুকরো করে কেটে পুড়িয়ে ছাই করতে হবে। ঐ ছাইটিকে চার ছয় গুণ জলে ভালো করে গুলে কাপড়ের ছাঁকনিতে একুশবার ছেঁকে নিলে ক্ষার প্রস্তুত হবে। সাধারণত এভাবে পটাশ কার্বনেট তৈরি হয়। তবে, এ বিষয়ে সুশ্রুতের বর্ণনা অনেক বিশদ। ক্ষারের গুণ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,— কাটা ছেঁড়ার সমস্ত রকম ওষুধের বা অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ। ক্ষারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— মৃদু ক্ষার, মধ্যম ক্ষার ও তীক্ষ্ণ ক্ষার। সুশ্রুত আবার সবক্ষার (পটাশকার্বনেট) ও সার্জিকাক্ষার (সোডিয়াম কার্বনেট) এই দু'প্রকার ক্ষারের উল্লেখ করেছেন।

তাঁর মতে, সোহাগাও ক্ষারের অন্তর্ভুক্ত।

বাগভট্ট, বৃন্দ ও চক্রপানি দত্তের রসায়ন ঃ বাগভট্টের রসায়নের চরক - সুশ্রুতের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। ক্ষার প্রস্তুতের ক্ষেত্রে তিনি সুশ্রুতকে অন্ধ অনুকরণ করেছেন। আয়ুর্বেদ রসায়নে উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের প্রাধান্যই সবচেয়ে বেশি। বাগভট্টের সময় থেকেই ঔষধ হিসাবে ধাতব ও খনিজের মিশ্রণ শুরু হয়। চিকিৎসক ও বৈদ্য উভয়েই এ বিষয়ে আগ্রহী হন, ফলে আয়ুর্বেদের একটি নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়। দশম শতকে বৃন্দ ও চক্রপানি দত্তের রাসায়নিক জ্ঞান ও রসায়ন চর্চা এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক। 'সিদ্ধযোগ' গ্রন্থে বৃন্দ পর্পটি তামা, রসাসৃত চূর্ণ প্রভৃতি পারদ দ্বারা নির্মিত কয়েকটি যৌগিক পদার্থ প্রস্তুতের নির্দেশ আছে। গন্ধক, তামা ও তাম্রমাক্ষিক ভালোভাবে গুঁড়ো করে পারদের সাথে মিশিয়ে একটি বন্ধ মুষার মধ্যে তাকে জারিত করলে পর্পটি তামা উৎপন্ন হবে। রসামৃত, চূর্ণ গন্ধক ও পারদ মিশিয়ে সম্ভব মার্কারি সালফাইড তৈরি করা হত। গন্ধকের সাথে অর্ধেক ওজনের পারদ মিশিয়ে ঘষে ঘষে রসামৃত তৈরি হত। পানের রসের সাথে পারদ ঘষে ছারপোকা-নাশক তৈরি করা হত। আমলকী ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের রসে লোহাকে ভিজিয়ে গরম করে কিভাবে এই ধাতুকে মারা যায় তার প্রক্রিয়াও গ্রন্থে বর্ণিত। চক্রপানি দত্তও তামা, লোহা, রুপো, পারদ প্রভৃতি দ্রব্যের যৌগিক প্রস্তুতি তার গ্রন্থে লিখেছেন।

তান্ত্রিক রসায়ন কিমিয়া ঃ সপ্তম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে চক্রপানি দত্ত, বৃন্দ ও বাগভট্টের মতো চিকিৎসক ও রসায়নবিদরা যখন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিভিন্ন যৌগিক দ্রব্য প্রস্তুত ও ওষুধ হিসাবে পারদের গুণাগুণ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন তখন একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের তান্ত্রিকরা এবিষয়ে আগ্রহী হন। ভারতীয় কিমিয়া মূলত তাদেরই সৃষ্টি। তপস্যা করার জন্য দেহকে কিভাবে সুস্থ, সবল, সতেজ ও নীরোগ রাখা সে বিষয়ে প্রয়োজন ছিল। তাই কিভাবে বা কোন দ্রব্য খেলে তা করা যায় সে বিষয়ে তান্ত্রিকরা নিরন্তর গবেষণায় রত ছিলেন। তাদের দীর্ঘ গবেষণায় জানা যায়, পারদ হল সেই বস্তু যা স্বাস্থ্যকে অটুট রাখতে পারে। ফলে তারা পারদকে কেন্দ্র করেই গবেষণা চালাতে থাকে। তান্ত্রিক কিমিয়ায় 'রস' শব্দের অর্থ পারদ এবং 'রসায়ন' পারদ বিজ্ঞান। তান্ত্রিক কিমিয়ায় সর্বাধিক যার নামোল্লেখ করা যায় তিনি লোহাশাস্ত্র, রসরত্নাকর কক্ষপুটতন্ত্র, আরোগ্য মঞ্জরীর রচয়িতা নাগার্জুন। এর পাশাপাশি এ বিষয়ে জানার উপাদান হল 'কাঞ্জুর' ও 'তাঞ্জুর' নামক দুইটি বিশ্বকোষ। এই তান্ত্রিক কিমিয়ার গ্রন্থগুলিতে যে ধরনের রাসায়নিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাহল—

রসরত্নাকর ঃ নাগার্জুনের এই গ্রন্থে প্রথমেই কৃত্রিম উপায়ে নিকৃষ্ট ধাতুকে সোনায় পরিণত করার কয়েকটি অসম্পূর্ণ প্রণালীর বিবরণ পাওয়া গেছে। রসক বা দস্তার খনিজ, হিঙ্গুল প্রভৃতি আরও কিছু দ্রব্যকে সোনায় পরিণত করার কিছু বিধান এই রসরত্নাকরে পাওয়া যায়। তবে একথা বলা যায়, দস্তার সাথে তামা মিশিয়ে যে সোনার রঙের দ্রব্য পাওয়া যায় তা পিতল ছাড়া কিছুই নয়। তাই পিতল প্রস্তুত প্রণালী এদেশে প্রাচীন। পারদ মারা ও বন্ধন ঝরা সম্পর্কে নাগার্জুন লিখছেন,— পারদের তরলতা, দ্যুতি বা গতিশীলতা প্রভৃতি গুণাগুণ নষ্ট হলে বুঝতে হবে পারদটি নষ্ট হয়ে গেছে। গুণাগুণ সঠিক আছে কিনা তা জানার জন্য পারদটির রং পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যদি সেটা উদীয়মান সূর্যের রং ও দ্যুতি ছড়ায় এবং আগুনের উত্তাপ সহ্য করতে পারে তাহলে সেটি ব্যবহারযোগ্য বুঝতে হবে।

দস্তা বা জসদ আবিষ্কার ঃ রসরত্নাকরে দস্তা বা জসদ নিষ্কাশনের পদ্ধতিতে বলা হয়েছে, রসক বা দস্তাটিকে

ক্ষার, লাক্ষা, সোহাগা, সদ্ধিত ধ্যান্ধ্যাবল, স্নেহ পদার্থ, ভুসা প্রভৃতির সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে বন্ধ মুষা বা পাত্রে আগুনে জারিত করলে টিনের মতো দেখতে পদার্থটির উদ্ভব হয়, তাই রসকের সারবস্তু। দস্তা নিষ্কাশনের এটিই প্রাচীন পদ্ধতি। দস্তার নিষ্কাশন যে সম্পূর্ণ হয়েছে তা জানা যায়, যদি গলিত দস্তা থেকে বেরিয়ে আসা শিখা নীল বর্ণ থেকে সাদা বর্ণ হয়ে যায়। প্রথমে উষ্ণতার প্রভাবে রসক দস্তার অক্সাইডে পরিণত হয়। তারপর ভুসা ও বিশ্লিষ্ট লাক্ষা অঙ্গারের সাথে দস্তার অক্সাইডের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে একদিকে অক্সাইড বিজারিত হয়ে দস্তাকে মুক্ত করতে থাকে, অন্যদিকে অক্সিজেন অঙ্গারের সাথে যুক্ত হয়ে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে। মনোক্সাইডের দহনেই নীল শিখার সৃষ্টি হয় এবং দস্তা নিষ্কাশন সম্পূর্ণ হলে তা বাষ্পীভূত হয়ে শিখার সংস্পর্শে এলে শিখার রং সাদা হয়। তাই সাদা শিখা দেখলেই বোঝা যায় দস্তা নিষ্কাশন সম্পূর্ণ হয়েছে। অবশ্য এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, নাগার্জুনের সময় রসক থেকে দস্তা নিষ্কাশনের পদ্ধতির আবিষ্কৃত হলেও দস্তাকে ধাতু হিসাবে চিনতে সময় লেগেছিল। রসরত্নাকরে যাদুযন্ত্রের উল্লেখ আছে। যেমন পেষণ যন্ত্র, বংশযন্ত্র, নালিকাযন্ত্র, গজদন্তযন্ত্র, দোলাযন্ত্র, অধপাতন যন্ত্র, পাতন, তুলা, বালুকা, মুষা প্রভৃতি যন্ত্রের উল্লেখ আছে। এই যন্ত্রের কথা উল্লিখিত গ্রন্থে বিশদে বর্ণিত আছে।

রসার্ণব ঃ এটি একটি তান্ত্রিক কিমিয়া পদ্ধতি বিভিন্ন ধাতু, খনিজ থেকে তা নিষ্কাশনের পদ্ধতি, ধাতু মারা পদ্ধতি, বিশুদ্ধ ধাতু চেনার উপায়, ধাতুর স্পর্শে শিখার রং পরিবর্তন, পাদর ও পারদ ঘটিত যৌগিক, ক্ষার এবং রাসায়নিক পরীক্ষার উপযোগী বিভিন্ন যন্ত্রপাতির বর্ণনায় এই গ্রন্থটি সমৃদ্ধ।

ধাতু ও ধাতু পরীক্ষা ঃ রসার্ণব বর্ণিত ছটি ধাতু হল সোনা, রূপা, তামা, লোহা, টিন ও সিসা। বিশুদ্ধ ধাতুর পরীক্ষা করতে মুষাযন্ত্রে একে গলালে কোনো আগুন শিখা বের হওয়ার বা বুদবুদ শব্দ বা পটপট শব্দ বেরোবে না। এই পদার্থটি মুক্তোর মতো শান্ত ও টলটলে দেখাবে। বিভিন্ন ধাতুর সংস্পর্শেই আগুনের শিখা বর্ণময় হয়। শিখা পরিবর্তনের দ্বারা ধাতু চেনার সহজ উপায়টি কিমিয়া রসায়নবিদরা জানতেন।

ধাতুনিষ্কাশন ঃ খনিজ থেকে ধাতু নিষ্কাশন পদ্ধতি প্রমাণসাপেক্ষ। মাক্ষিক, বিমল প্রভৃতি তামার খনিজ থেকে তামা-নিষ্কাশনের প্রক্রিয়াটি হল— মধু, এরন্ডর তেল, গোমূত্র, ঘৃত ও কলার নির্যাসের সাথে মাক্ষিককে বার বার ভিজিয়ে মুষার মধ্যে উত্তপ্ত করলে তামা পাওয়া যাবে। বিমল মাক্ষিকের মতো আর একটি তামার খনিজ। রসকের সাথে পশম, গালা, সোহাগা; হরিতকী মিশিয়ে বন্ধ মুষায় জারিত করলে দস্তা পাওয়া যায়। যা দেখতে টিনের মতো।

ধাতুমারা ঃ ধাতুমারার পদ্ধতিটি রসার্ণবে বর্ণিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত দ্রব্যের নাম 'বিদ'। এর দ্বারা সকল ধাতুকেই মারা যায়। গন্ধক, হরিতাল, সামুদ্র, নিশাদল, সোহাগা ও উদ্ভিদভস্মকে মিশিয়ে এক ধরনের বিদ তৈরী করা হয়।

রাসায়নিক যন্ত্রপাতি ঃ রসার্ণবে বর্ণিত কয়েকটি যন্ত্রপাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দোলা যন্ত্র, মুষাযন্ত্র, কোষ্ঠীযন্ত্র, গর্ভযন্ত্র ও হংসপক্ষ যন্ত্র। পাত্রের অর্ধেক তরলপদার্থ দ্বারা দোলাযন্ত্রটিকে ভর্তি করে, এর মুখে অবস্থিত শলাকা থেকে একটি কাপড়ের থলি ঝোলানো হয়। তার মধ্যে দ্রব্য থেকে পাত্রটির তরল থেকে উদ্ভূত বাষ্পে উত্তপ্ত করা হতো মুষাযন্ত্রে অবস্থিত দুটি লোহা মুষা থাকে। মধ্যে একটি মুষা ছিদ্র। দুটি ছিদ্রের একটিতে পারদ ও অপর টিতে

গন্ধক নিয়ে প্রথম মুষাটিকে দ্বিতীয়টির ওপর রাখা হল। মাটির পাত্রে জল রেখে তার মধ্যে মুষা দুটিকে বসিয়ে আর একটি মাটির পাত্র উপুড় করে বসিয়ে মাটির প্রলেপ দিয়ে কাজ করা হয়। গর্ভযন্ত্রের সাহায্যে পারদ ও গন্ধ কপারদের মিশ্রণকে ভস্মীভূত করা হয়। রসরত্নাকরে এর উল্লেখ আছে। ধাতু নিষ্কাশন ক্ষেত্রে কোষীযন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

বাগভট্ট, বৃন্দ, চক্রপানি দত্তের সময় থেকেই ওষুধ তৈরিতে রসায়নের প্রয়োগ শুরু হয়। তান্ত্রিক যুগে তা গুরুত্বপূর্ণ হলেও সর্বক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা যায়নি। বিশেষ বিশেষ রোগ প্রতিরোধ, দীর্ঘ জীবন লাভ করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাসায়নিক ওষুধ আবিষ্কারেই তান্ত্রিক কেমিয়াবিদরা বেশি মনোযোগী হন। তবে এর দ্বারা যে পারদ ও তৎসম্পর্কিত জ্ঞানের প্রসার ঘটে ও নানা যৌগিক দ্রব্য প্রস্তুত বিদ্যা আয়ত্ত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

উপসংহার ঃ বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সূচনা হয়েছিল সুপ্রাচীনকাল থেকে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার, সূত্র ধরে ভারতের সঙ্গে চীন, আরব, সিরিয়া, পারস্য প্রভৃতি বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বেদ পরবর্তী যুগে ভারতের জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতির কথা ও বিখ্যাত জ্যোতির্বিদদের কথা আমরা জেনেছি। জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই উন্নত হয়েছিল গণিতচর্চা তৎকালীন জ্যোতির্বিদরা গ্রহ নক্ষত্র বিষয়ে এমন সব তথ্য রেখে যান যা সত্যিই বিস্ময়কর। শুধু গণিত বা জ্যোতির্বিদ্যা নয় চিকিৎসাবিজ্ঞান বিশেষত আয়ুর্বেদশাস্ত্রে যে প্রাচীন ভারত উন্নতি করেছিল তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। এর সঙ্গে সূচনা হয়েছিল রসায়নশাস্ত্র চর্চা, যাকে আমরা বর্তমান রসায়ন চর্চার প্রাথমিক প্রয়াস বলতে পারি। তাই বলা যায় বর্তমান ভারতবর্ষের আধুনিক বিজ্ঞান ভাবনার ভিত্তি নিহিত আছে প্রাচীন বিজ্ঞানচর্চার মধ্যে।

3.5 গ্রন্থপঞ্জী

1. P. Roy (ed) — History of Chemistry in Ancient and Medieval India.
2. G. R. Kaya — Indian Mathematics.
3. D. Chattopadhayay — Studies of the History of Science in India.
4. D. Chattopadhayay — Science and Society in Ancient India.
5. A. L. Basham — The Wonder that was India.

3.6 প্রশ্নাবলী

১। পঞ্চম শতক থেকে ত্রয়োদশ দশকের ভারতীয়দের বিজ্ঞানচর্চার বিবরণ দিন।

২। পঞ্চম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভারতীয়দের জ্যোতির্বিদ্যাচর্চার বিবরণ দিন।

একক 4 ❐ পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে নতুন চিন্তাধারার উন্মেষ

গঠন

4.0 প্রস্তাবনা

4.1 অগ্রহার ব্যবস্থা

4.2 অর্থনৈতিক পরিবর্তন

4.3 জাতি ব্যবস্থার বিস্তার

4.4 পঞ্চম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থা

4.5 গণিকা বৃত্তি

4.6 পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতকের ভারতবর্ষে ধর্মের রূপান্তর

4.7 স্থাপত্য ও শিল্পকলা

4.8 পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তন

4.9 প্রশ্নাবলী

4.10 গ্রন্থপঞ্জী

4.0 প্রস্তাবনা

৩০০-৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অগ্রহার ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটায় সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে যে নতুন প্রবণতার জন্ম হয়, তার পরিণত রূপ খ্রীষ্টীয় ৬৫০-১২০০ পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। তাম্রশাসন জারি করে নিষ্কর জমি বা গ্রামের রাজস্বদান করার ঘটনা কার্যত সর্বভারতীয় রূপ নেয়। এই ব্যবস্থা একই সঙ্গে জটিলতর হয়ে ওঠে ও তার স্থানীয় বৈশিষ্ট্যও বাড়তে থাকে। কার্যত আলোচ্য আমলের রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে আঞ্চলিকতার প্রভাব যথেষ্ট। আঞ্চলিকতার এত ব্যাপক প্রকাশ আগের পর্বে দেখা যায় না। রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপক্ষটিও এই প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সমগ্র উপমহাদেশে এত বেশি রাজনৈতিক শক্তির সহাবস্থান আগে পরিলক্ষিত হয়নি। গুপ্ত সাম্রাজ্যের মতো প্রায় সমগ্র আর্যাবর্ত বা বকাটকদের মতো সমগ্র দাক্ষিণাত্যের ওপর রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের দৃষ্টান্তও বিরল। পরাক্রান্ত রাজনৈতিক শক্তিগুলি কমবেশি পরিমাণে আঞ্চলিকতার দ্বারাই চিহ্নিত। বাংলার পাল ও সেন বংশ, উত্তর ও পশ্চিম ভারতের গুর্জর প্রতিহারগণ, দাক্ষিণাত্যের

রাষ্ট্রকূট বংশ ও সুদূর দক্ষিণের চোল সাম্রাজ্য সামরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে বিশেষ শক্তিশালী হলেও এলাকাভিত্তিক শক্তি হিসাবে তাদের শনাক্ত করা যায়।

উত্তর ভারতের ক্ষেত্রে স্থানীয় শক্তির উত্থানের চিত্রটি *হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী*-এর লেখাগুলি থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়। দক্ষিণ ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে স্থানীয় শক্তিগুলির পরিচয় পাওয়া যায় *নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী* ও *সদাশিব অলটেকারের* রচনায়। শিল্পের ক্ষেত্রেও আঞ্চলিকতা আমাদের নজরে পড়ে। আঞ্চলিক ভাষাগুলির প্রাথমিক রূপও এই আমলেই জানা যায়। ভারতীয় ইতিহাসের প্রায় সবক্ষেত্রেই আঞ্চলিকতার এত বেশি প্রভাব পূর্ববর্তী আমলে দেখা যায় না। সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনীতি, শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার উদ্ভব ও প্রসার বিষয়ে ঐতিহাসিকরা বিশেষ সচেতন ঃ কিন্তু ইতিহাসের নানা ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার বৃদ্ধি কেন এবং কিভাবে ঘটে থাকতে পারে, তা বিশ্লেষণের জন্য একটি যুক্তিগত কাঠামো প্রস্তুত করার প্রয়াস খুব বেশিদিন শুরু হয়নি।

রাজনৈতিক দিক থেকে গুপ্ত যুগে প্রথম আমরা বিকেন্দ্রীকরণের আভাস পাই। এই সময় থেকে অনেক শাসন সংক্রান্ত পদে যোগ্যতা অপেক্ষা উত্তরাধিকারকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে শাসন ব্যবস্থায় দুর্বলতা বিশেষভাবে ফুটে ওঠে। গুপ্তরা এবং তার পরবর্তী পর্যায়ের শাসকরা নগদে বেতন দিতেন না। জমির দ্বারা তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হত। এর ফলে গুপ্ত যুগে এক ধরনের সামন্ত প্রথার উদ্ভব ঘটে। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে এই সামন্তরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে ছিল। অতিরিক্ত বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করার ফলে বিস্তৃত সাম্রাজ্যের খুঁটিনাটি খবর, কেন্দ্রে আর পৌঁছাত না। বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসকরা তাদের অবস্থান, পাকা করতে শুরু করে। উত্তরাধিকার সূত্রে দীর্ঘদিন ধরে একই জায়গায় শাসন করার ফলে তারা স্থানীয় আনুগত্য পুরোপুরিভাবে অর্জন করে। দূরবর্তী অঞ্চলের জনগণের ক্ষোভ, সামন্ত বা বিদ্রোহী জনগণের মনোভাবের বিরুদ্ধে রাজা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন না। এরই ফলস্বরূপ, বিভিন্ন সময় সাম্রাজ্যের খণ্ডিকরণ সম্ভব হয়।

4.1 অগ্রহার ব্যবস্থা

গুপ্ত রাজাদের আমলে প্রথম অগ্রহার ব্যবস্থার প্রচলন হয়। গুপ্ত রাজারা ব্রাহ্মণ, দেবালয়, মন্দির, বৌদ্ধ মঠ ও বিহারকে ভূমিদান করেন। পূর্ব ভারতের পাল, পশ্চিম ভারতের বকাটক ও দক্ষিণের চোল রাজারা ভূমিদান করেন। এইসব জমির বেশিরভাগই ছিল পতিত ও অনাবাদী। এইসব জমির সীমানা চিহ্নিত করে রাজারা হস্তান্তর করতেন। মধ্যভারত, পশ্চিম ভারত ও দাক্ষিণাত্যে এই পর্বে যেসব জমি অগ্রহার হিসাবে দেওয়া হয়, তাতে অবশ্য চাষবাস ছিল। পশ্চিম ভারতে বকাটক আমলে ৩৫টি গ্রাম অগ্রহার হিসাবে দান করা হয়েছিল। তবে গ্রাম দান করা হলেও গ্রামের ওপর সব অধিকার দান গ্রহীতা পেত না। *অধ্যাপক রামশরণ শর্মা* জানিয়েছেন যে, দানগ্রহীতা শুধু রাজস্বের অধিকারী হতেন না। তিনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও বিচারকার্য পরিচালনার দায়িত্বও পেতেন। দানগ্রহীতারা তাদের চাষবাসের জন্য কৃষক নিয়োগ করতেন। ফলে, রাজা ও কৃষকের মধ্যে মধ্যসত্ত্বভোগীর আবির্ভাব ঘটে। অগ্রহার ব্যবস্থায় দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণ, মন্দির, বৌদ্ধ বিহার এসবই ভূম্যধিকারীতে পরিণত হয়েছিল। আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, অগ্রহার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে কৃষির সম্প্রসারণ ঘটেছিল, অধিকাংশ অগ্রহার জমি ছিল পতিত ও অনাবাদী ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অগ্রহার ব্যবস্থার প্রভূত সম্প্রসারণ ঘটে। বৈষ্ণব ও শৈব মন্দিরগুলি ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হয়ে ছিল। পূর্ব ভারতের বৌদ্ধ বিহার নালন্দার অধীনে ছিল ২০৯টি গ্রাম। বাংলার চন্দ্র, বর্মণ, দেব প্রভৃতি

রাজবংশগুলি প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজারা ব্যাপকভাবে ভূমিদান করেন। এর ফলস্বরূপ একাদশ ও দ্বাদশ শতকে *'ব্রহ্মদেও'* ও *'দেবদান'*-এর অজস্র নজির ছড়িয়ে আছে।

4.2 অর্থনৈতিক পরিবর্তন

অধ্যাপক রামশরণ শর্মার বিচারে অর্থনীতি তথা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতা বৃদ্ধি পাওয়ার মূল কারণ ছিল— এক বিকেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক কাঠামোর উদ্ভব ও বিকাশ। এই বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার বিচার শর্মা করেছেন ভারতীয় সামন্ততন্ত্র— এর তত্ত্বগত কাঠামোর ভিত্তিতে। এই ব্যবস্থা পিরামিড সদৃশ। তার চূড়ায় থাকেন রাজা। কিন্তু, রাজা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নন। তাঁর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা সামন্ত বা অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে বণ্টিত হয়। প্রথম শর্ত অনুযায়ী সামন্ত রাজাকে যুদ্ধের সময় সৈন্য ও রসদ সরবরাহ করতে বাধ্য থাকেন। দ্বিতীয় শর্ত অনুযায়ী, রাজাকে মন্ত্রণা দেওয়াও তার কর্তব্য। এই শর্তে রাজ্যের ভূখণ্ড রাজার কাছ থেকে প্রধান সামন্ত, প্রধান সামন্ত থেকে মধ্য সামন্ত এবং মধ্য সামন্ত থেকে ক্ষুদ্র সামন্তের মধ্যে বিতরিত হয়। এই পরিস্থিতিতে রাজার সার্বভৌম ক্ষমতা লোপ পায়, তার ফলে রাষ্ট্র পরিচালনায় কেন্দ্রীয় শক্তির অস্তিত্ব ও কৃর্তত্ব বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আদি মধ্য যুগে সামন্তপ্রথার উদ্ভব ও প্রসারের যে ছক রামশরণ শর্মা পেশ করছেন, সেই ছকে তিনি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সামন্ত প্রসারে উৎপাদন ব্যবস্থা হিসাবেই দেখেন।

সামন্ত প্রথার উদ্ভবের ফলে একদিকে ভূমি ব্যবস্থায় জটিলতার সৃষ্টি হয়। মধ্যসত্ত্বভোগী ভূ-স্বামীদের আবির্ভাব কৃষকের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ও রাজকীয় রাজস্বে ভাগ বসাতে থাকে। অধ্যাপক রামশরণ শর্মা মনে করেন যে, দানগ্রহীতারা কার্যত ভূ-স্বামীতে পরিণত হয়েছিলেন। কলিযুগের বর্ণনা থেকে শর্মা অনুমান করেছেন যে, শাসকের পক্ষে রাজস্ব আদায় করা যখন কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে, তখন রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ভূ-স্বামীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

গ্রাম দান করে অগ্রহার ব্যবস্থায় নিষ্কর জমিদানের পদ্ধতি দক্ষিণ ভারতেও প্রকট। চোল লেখমালার উপর গবেষণা থেকে দেখা গেছে, চোল আমলের গোড়ায় অ-ব্রহ্মদেও গ্রামগুলি কৃষি কাজের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল। পুর অঞ্চলে কৃষকদের সংখ্যাধিক্য থাকলেও জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার চেতনা স্পষ্ট নয়। যৌথ মালিকানার ধারণা যেখানে এত প্রবল, সেখানে ব্যক্তিগত মালিকানার সম্ভাবনা অল্প থাকে। দুটি লেখমালার ভিত্তিতে কারাশীমা দেখিয়েছেন যে, কল্লিড়ম্ নদীর দক্ষিণ দিকের বাসিন্দারা যাতে নদীর উত্তরে কীলপালবুর এলাকায় কোনো জমি না কিনতে পারেন তার প্রতি নিষেধাজ্ঞতা জারী করা হয়েছিল।

গ্রামকেন্দ্রিক স্বনির্ভর অর্থনীতিতে ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার যেমন কমে যেতে পারে, তেমনি কারিগরী শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে নগরের অস্তিত্ব হয়ত আপেক্ষিকভাবে কম প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিতে পারে। *বি. এন. এস. যাদব* দেখিয়েছেন, সেই সময় নগরায়ণের অবক্ষয় হয়েছিল। অধ্যাপক শর্মা দেখিয়েছেন, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের পর জনবসতির অস্তিত্ব অনেকগুলি নগর থেকে হারিয়ে যায়।

কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বহু প্রকার পণ্য শস্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। চিনি শিল্পের কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্ত্রশিল্পের গুরুত্ব আগের যুগের মতোই অব্যাহত ছিল। তৈলবীজের উৎপাদন ব্যাপক হওয়ায় তৈলোৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটেছিল। শিল্প অর্থনীতির ক্ষেত্রে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ধাতু বিশেষ করে লোহার ব্যবহারের বৃদ্ধি। রামশরণ শর্মা কোনারকের সূর্যমন্দিরে ও পরীর গুণ্ডিচাবাড়িতে লোহার ব্যবহার লক্ষ্য করার মতো।

লালনজী গোপাল মনুস্মৃতির ওপর নির্ভর করে মত প্রকাশ করেছেন যে, সেই সময় সদস্যদের ওপর গিল্ড বা শ্রেণীর প্রভাব বোধহয় আগের মতো ছিল না। নারদস্মৃতির ভিন্নমত থেকে অনুমান করা যায় যে, শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ পরিচালন ব্যবস্থার ওপর শাসকীয় ক্ষমতা বাড়ছিল, শ্রেণীর স্বাতন্ত্রতা ফলে ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের অনুসরণে বলা চলে যে, আদি মধ্যযুগের শ্রেণী কোনো একটি বৃত্তিতে নিযুক্ত সকল কারিগরের একটি সংগঠন হিসাবে টেকেনি, এগুলি ক্রমশ এক একটি পরিবারকে ভিত্তি করে গড়ে উঠতে থাকে। এদিক থেকে বিচার করলে শ্রেণীর সাংগাঠনিক ভাঙন অস্বীকার করা যায় না। রাজকীয় হস্তক্ষেপ, শ্রেণীগুলির জাতিতে রূপান্তর ঘটায় তাদের সামাজিক অবনমন, শ্রেণীগুলির ক্রমে পারিবারিক সংগঠনের আকার ধারণ ও শ্রেণীতে অর্থলগ্নীর বিরলতা সম্ভবত এই যুগের 'শ্রেণী সংগঠনের অবক্ষয়' কেই তুলে ধরে।

উত্তর ভারতের স্থানীয় বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে মণ্ডপিকা যেমন বিকশিত হয়, দক্ষিণ ভারতে অনুরূপ বাণিজ্য হিসাবে 'নগরম্'-এর উল্লেখ লেখমালায় পাওয়া যায়। কেনেথল চোল আমলের লেখমালায় এই রকম ৩৩টি নগরম্ উল্লেখ পেয়েছেন। মলের গবেষণা থেকে মনে হয় যে, নগরমগুলি একদিকে একটি নাড়ুতে অবস্থিত বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকার সাথে লেনদেন-এ লিপ্ত ছিল, আবার অন্যদিকে একই সঙ্গে অন্যান্য নাড়ুর নগরম্ এর সঙ্গেও বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় থাকত।

ভারতীয় ৬০০-১০০০ পর্যন্ত উত্তর ভারতের মুদ্রার অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত মুদ্রার অব্যহত ব্যবহার বাণিজ্যের গতিময়তাকেই প্রমাণ করে। একথা ঠিক যে, দক্ষিণ পূর্ববঙ্গে মুদ্রার নিয়মিত উপস্থিতি দেখা যায়, কিন্তু সমকালীন উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে পাল-সেন আমলের কোথাও কোনো মুদ্রা পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে কড়ির ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। বিনিময় প্রথার কথাও অস্বীকার করা যায় না।

4.3 জাতি ব্যবস্থার বিস্তার

আদি মধ্যযুগ ছিল জাতি বিস্তার এবং খণ্ড-বিচ্ছিন্নতার যুগ। প্রচলিত বর্ণ অনেকগুলি জাতির জন্ম দিয়েছে এবং প্রচুর নতুন উপজাতি এবং জাতি তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বাংলার তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, দশম শতাব্দীতে বৃহৎ-চত্তিবন্নমা বা ছত্রিশটি বর্ণের বাসভূমির নামে একটি গ্রাম ছিল। জাতি বিস্তারের পদ্ধতি উল্লেখযোগ্যভাবে শুরু করেছিল ব্রাহ্মণেরা। আনুষ্ঠানিক রীতি পদ্ধতির চর্চা করে বা বৈদিক শিক্ষা চর্চার মধ্যে দিয়ে ব্রাহ্মণ জাতি পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তী মধ্যযুগে রাঢ় বাংলায় ব্রাহ্মণরা তাদের মূল গ্রামের (গ্রামী) উপর ভিত্তি করে ছাপ্পান্নটি উপজাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই গ্রামগুলির উল্লেখ আছে একাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর লিপিতে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে, ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেশ ভেদ অনুযায়ী জাতিভেদ প্রথা প্রবল ভাবে কাজ করত।

ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ে 'রাজপুত' নামক নতুন জাতির উত্থানের ফলে জাতির বিস্তার হয়েছিল। রাজপুতদের মতো জাতিগত ও বংশগত গৌরব অন্য কোনো সম্প্রদায় উন্নতি করেনি। এদের মধ্যে কেউ কেউ তুমুল ক্ষত্রিয় থেকে এসেছে। প্রায় সপ্তম শতাব্দী থেকে প্রচারিত লিপিগুলিতে তাদের সূর্য ও চন্দ্রবংশোদ্ভুত বলে আরোপ করা হয়েছে।

আদি মধ্যযুগে শূদ্রদের সংখ্যাধিক্য ঘটে। প্রথমদিকের সাহিত্যগুলিতে দশ-পনেরোটি মিশ্র জাতির উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রায় দ্বিতীয় শতাব্দীর মনুসংহিতায় আছে ৬১টি মিশ্র জাতি। শূদ্র জাতির সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বেড়ে

যাওয়ার কথার উল্লিখিত হয়েছে যাদব প্রকাশের 'বৈজয়ন্তী' এবং হেমচন্দ্রের 'অভিধান চিন্তামণি'তেও। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে শূদ্র জাতি গুণিতক হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তা হল, কারুশিল্প থেকে জাতিতে রূপান্তর। গুপ্তোত্তরকালে ব্যবসা-বাণিজ্য ঝিমিয়ে পড়ায় কারীগরি শিল্প বাণিজ্য স্থানু, বংশানুক্রমিক এবং স্থানিক হয়ে যাচ্ছিল। ভূমিকেন্দ্রিক শ্রেণী বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতি এবং গোষ্ঠী কাঠামোর মধ্যেকার সম্পর্ক প্রভাবিত হয়েছিল। লিপি থেকে জানা যায়, অনুগত পুরোহিতরা ভূমিকেন্দ্রিক ও শাসক পরিবারগুলির বংশগত প্রাধান্য দেখাত। ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দী এবং তার পরবর্তী কালে প্রাচীন গোষ্ঠী ভিত্তিক সংযোগে তাদের অহংকার ছিল। কারণ, তারা সূর্য ও চন্দ্রের বংশধর বলে দাবি করত। এটি সম্পূর্ণই ছিল মিথ নির্ভর।

বর্তমান সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, উত্তর ভারতের প্রাক মুসলমান সমাজে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছিল। ভূমি ও সামরিক ক্ষমতার অসম বিভাজন, নানা মাপের সামন্তপদ সৃষ্টি করেছে, যা বিশেষ করে উচ্চ এবং শিক্ষিত স্তরে বর্ণের মধ্যে দেখা যায়। বারবার ভূমিদান ও জমির ভাগাভাগির ফলে নব স্বাক্ষর শ্রেণীর উত্থান ও অগ্রগতি হয়। এদের বলা হত 'কায়স্থ'। বর্ণ ব্যবস্থায় এদের স্থান কোথায় তা স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা হয়নি। এই সময় বর্ণ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস হয়েছিল। ফলে, বাংলা ও দক্ষিণ ভারত প্রধানত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদের জন্য নতুন বর্ণ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এই সামাজিক পরিবর্তন বোঝা যাবে কঠোর সামন্ততান্ত্রিক আঞ্চলিকতার অবস্থা থেকে। এই অবস্থার মূলে ছিল অর্থনীতির পরিবর্তন এবং ব্রাহ্মণ্যসমাজে উপজাতিদের গ্রহণ। উপজাতিরা গৃহীত হয়েছিল যুদ্ধ জয় বা ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের মধ্যে দিয়ে।

4.4 পঞ্চম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থা

প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থগুলিতে নারীর অবস্থা, তার প্রতি পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোবৃত্তির কথা উল্লেখ আছে। এর ওপর ভিত্তি করেই নারীর উচ্চতর ও নিম্নতর উভয় প্রকার মর্যাদারই পর্যালোচনা করা যায়। প্রাচীন শাস্ত্রে নারীকে শূদ্রের পর্যায়ভুক্ত অচ্ছুৎ না করা হলেও, সে ছিল সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ওপর তার কোনো অধিকার ছিল না। মনু তার 'স্মৃতিশাস্ত্রে' নারীকে চিরকাল দাসীরূপে রাখার কথা ঘোষণা করেছেন। তার মতে, দাস ও নারীর সম্পত্তির ওপর কোনো অধিকার নেই। নারী কেবলমাত্র স্ত্রী ধনের অধিকারী। অর্থাৎ আত্মীয় পরিজন যে সমস্ত রত্ন, বস্ত্র জাতীয় মূল্যবান অস্থাবর সম্পত্তি দান ও উপহার হিসাবে প্রদান করে, তার গ্রহণকারী ও রক্ষাকারী ছিল নারী। কিন্তু, সকল নারীর ক্ষেত্রে একথা বলা হলেও, দেখা যায়, বাস্তবে কেবলমাত্র ধনী নারী ও উচ্চতর সম্প্রদায়ের নারীরাই এই ব্যবস্থার সুযোগ পেত। তবে, ক্রমেই নারী নিজেই সম্পত্তি রূপে পরিগণিত হতে থাকে। প্রাচীন শাস্ত্রগুলির বহু অনুচ্ছেদ ও টীকায় নারী ও সম্পত্তিকে সমতুল মনে করা হয়েছে। গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের অনুচ্ছেদগুলির বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নারীকে অস্থাবর সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হয়েছে। আদি মধ্যযুগের সাহিত্যে এর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে মনে করা হয়, আদি-মধ্যযুগের নারীর বিশেষত উচ্চশ্রেণীর নারীর দাসত্ব চরমে ওঠে।

আদি-মধ্যযুগের সমাজে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা যখন বিকশিত হয়, তখন থেকেই নারীর ওপর পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। তাকে অস্থাবর সম্পত্তি বলে গণ্য করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর থেকেই সতী প্রথার বীজ বপন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হেরোডোটাসের মতে, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে মধ্য এশিয়ার সিথিয়ানদের মধ্যে

বিধবাদের দাহ করার দৃষ্টান্ত আছে। গুপ্ত ও গুপ্ত পরবর্তী যুগে মহাকাব্য ও পুরানের মূল অংশে সতীদাহ প্রথাটিকে মুক্ত করা হয়। তবে, ৫১০ খ্রীষ্টাব্দ বা খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের আগে সতীপ্রথার লিখিত কোনো উল্লেখ ছিল না। এর পরবর্তী লেখ গুলিতে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমভাগ ও রাজস্থানে সতী স্মারক শিলা আবিষ্কৃত হয়েছে। আমাদের দেশে দু'প্রকার স্মারক শিলালিপি দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতে বীরকল নামে বীর স্মারক শিক্ষা দেখা যায়। এগুলি মূলত নিজের গ্রাম, পরিবার, গবাদি পশু অথবা প্রভুর রক্ষার্থে যারা আত্মবলিদান করেছে, তাদের স্মৃতিতে তৈরি। ভারতে বিশেষত প্রাচীন রাজপুত রাজ্যগুলিতে সতী স্মারক শিক্ষা পাওয়া যায়। এর মধ্যে কিছু মধ্যপ্রদেশের কলচুরি ও চান্দেল্ল রাজ্যে দেখা যায়। কিন্তু এদের অধিকাংশই পাওয়া যায় রাজস্থানে।

গুপ্ত ও পরবর্তী গুপ্ত যুগে সতীদাহের কিছু কারণ নির্দেশ করা হয়েছে। এটি উচ্চবর্গীয় প্রথা ছিল। কারণ নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে বিধবা বিবাহ এবং নিয়োগ প্রথার প্রচলন ছিল। সাহিত্য থেকে প্রাপ্ত সূত্রে জানা যায়, প্রাক গুপ্ত যুগেও উচ্চতর বর্ণের মধ্যে নিয়োগ ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। স্বামীর ঔরসে যে পত্নী সন্তান উৎপাদনে অক্ষম ছিলেন, তার জন্য এই নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। ধর্মশাস্ত্রে তার উল্লেখ আছে। সেক্ষেত্রে অক্ষম স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কোনও আত্মীয় অথবা সে গ্রামের কোনও অধিবাসীর দ্বারাও সন্তান উৎপাদন করার রীতি ছিল। তবে, এক্ষেত্রে কাউকে পাওয়া না গেলে ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করা হতো। প্রথম খ্রীষ্টাব্দের শতকগুলিতে ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই প্রথা বন্ধ হয়ে যায়। মনু একে ব্রাহ্মণের জন্য পাশবিক আচরণ বলে এই প্রথার নিন্দা করেছেন। শুধুমাত্র শূদ্রদের এই অনুমতি ছিল। গুপ্ত ও পরবর্তী গুপ্ত যুগে শূদ্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। একথা বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যা শূদ্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উচ্চবর্ণের বিধবা নারীরা এক সংকটের সম্মুখীন হন। আধিপত্যকারী ব্রাহ্মণ সমাজ বিধবাদের ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করে, তাদের জন্য কঠোর ত্যাগের জীবন নির্দেশিত হয়। মনে হয়, এই অবস্থায় যখন বিধবা রমণীদের স্বামীর সাথে সহমরণে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হত, তখন তারা অকল্পনীয় দুঃখের হাত থেকে রক্ষা পেতে সতীদাহকেই বেছে নিত। তাই বলা যায়, উচ্চতর বর্ণের মধ্যে নিয়োগ প্রথা ও বিধবা বিবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সতীদাহ প্রথার ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়।

রাজপুত যোদ্ধাদের জীবনে মর্যাদার প্রশ্ন ছিল সবচেয়ে বড়। মর্যাদা রক্ষার জন্য সতীদাহ প্রথা তারা পালন করত। এমনকী এ কারণে শিশু ও নারী হত্যাতেও তাদের আপত্তি ছিল না। আসন্ন পরাজয়ের মুখোমুখি হলে তারা এই পথ বেছে নিতেন। কারণ, নির্মম ও নির্বিবেক শত্রুর হাতে স্ত্রী ও সন্তানদের তুলে দেবার জন্য তাদের বাঁচিয়ে রাখা তারা নিরর্থক মনে করতেন। সুলতানী আমলের প্রথম দিকে সতীর সহমরণের আয়োজন করার আগে সরকারের কাছ থেকে বৈধ অনুমতিপত্র নিতে হত। তাছাড়া, সতীদাহের কথা ভাবা সম্ভব ছিল না।

4.5 গণিকা বৃত্তি

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে গণিকাদের সামাজিক মর্যাদার রূপান্তর ঘটে। অর্থশাস্ত্র, কামসূত্র এবং অন্যান গ্রন্থ থেকে যা তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখি, গণিকার স্থান সবচেয়ে উপরে, রূপে, যৌবনে, শিক্ষা-দীক্ষায় সেই শ্রেষ্ঠ। গণিকা যখন গণিকালয়ে বাস করত তখন রাষ্ট্র তার শিক্ষার ব্যয়ভার গ্রহণ করত, তার আয় থেকে নির্দিষ্ট রাজস্ব আদায় করত এবং কৌটিল্য বার্ধক্যে তাকে বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব ও অধিকার দুই-ই তার ছিল। গণিকা রাষ্ট্র থেকে মাসিক হাজার পণ পেত, তার চৌষট্টি কলা শিক্ষার জন্য বিভিন্ন

শিক্ষককে রাষ্ট্র নিজ ব্যয়ে নিযুক্ত করত। বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে দেখা যায়, গণিকা সালাবতীর জন্য তার মা সিরিমা এক রাতে হাজার কারষাপন নিত। গণিকা আম্রপালীর দক্ষিণা নিয়ে রাজগৃহ ও বৈশালীর মধ্যে রীতিমত কলহ হয়ে গিয়েছিল। '*জ্ঞাতধর্মকথা*' নামে জৈন গ্রন্থে দেখি, সর্বাঙ্গসুন্দরী ও শিক্ষিতা গণিকার প্রতি রাতের আয় ছিল সহস্র কারষাপন। মৃচ্ছকটিক-এ পড়ি, বসন্তসেনাকে একবার নিয়ে যাওয়ার জন্য দশ হাজার টাকার গহনা সমেত গাড়ি পাঠিয়েছিল শকার। কাজেই উপরের দিকে রূপ, যৌবন, যশ, অর্থে প্রখ্যাত গণিকার আয়ের কোনো লেখাজোখা ছিল না। এদের দানের পরিমাণ দেখলেই সেটা কতকটা বোঝা যায়— কেউবা বুদ্ধ ও এক সহস্র শিষ্যকে আহারে নিমন্ত্রণ করেন, কেউ বা আমবাগান দান করেন, কেউ মঠ, কেউ বিহার, কেউ কানন, চৈত্য, স্তূপ ইত্যাদি নির্মাণ করে দেন। এই সমস্তই প্রমাণ করে গণিকাবৃত্তি এবং প্রথিতযশা গণিকারা সেই সময়ের সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল।

প্রাচীন গ্রীস, রোম, মিশর, ফিনিশিয়া এবং ভারতবর্ষ সর্বত্রই মন্দির গণিকার একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। সেখানেই নগর সভ্যতার পত্তন হয়েছে এবং কোনো কোনো মন্দির সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে, সেখানে দেবদাসীর প্রাদুর্ভাব ছিল। মন্দির পুরোহিত রাষ্ট্র থেকে বৃত্তি পেতেন, তা দিয়ে তিনি দেবদাসীদের ভরণপোষণ করতেন। কখনও কখনও দেবদাসীরাও বৃত্তি পেতেন। দেবদাসীদের কাজ ছিল পূজা, আরাত্রিকের সময় মন্দির প্রাঙ্গণে দেবতাদের উদ্দেশ্যে নৃত্য করা। তাদের গৌণ অথচ সর্বজনবিদিত ভূমিকা ছিল পুরোহিতদের কামনা চরিতার্থ করা।

দেবদাসী তরুণী, সুন্দরী ও নৃত্যকুশলী হলেই চলত। কিন্তু গণিকার পাঠ্যতালিকা দীর্ঘ ছিল। জৈন গ্রন্থ '*বৃহৎকল্পভাষ্যে*' দেখি, এদের শিখতে হতো লেখা, গণিত, নানারকম শিল্প, সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র, দ্যূতক্রীড়া, অক্ষক্রীড়া, কাব্য রচনা, গন্ধযুক্তি (আতর তৈরি), অলঙ্কার নির্মাণ, সজ্জা, অলঙ্করণ, সুলক্ষণ ও দুর্লক্ষণ, পুরুষ ও নারীর বিচার, অশ্ববিদ্যা, হস্তীবিদ্যা, রন্ধনবিদ্যা, রত্ন পরীক্ষা, বিষনির্ণয় ও প্রতিবিধান, স্থাপত্য, শিবির নির্মাণ, সেনাসন্নিবেশ, যুদ্ধবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, নিমিত্ত নিদান, ইত্যাদি মোট বাহাত্তরটি বিষয়ে শিক্ষা আবশ্যক ছিল একজন উচ্চমানের গণিকার পক্ষে।

গণিকা ও রূপাজীবী যেমন রাষ্ট্রকে আয়কর দিত তেমনি বিনিময়ে সামান্য কিছু নিরাপত্তার ব্যবস্থাও পেত। গণিকা কন্যাকে ধর্ষণ করলে চুয়ান্ন পন ও তার মায়ের আয়ের ১৬ গুণ অর্থ দণ্ড দিতে হত। এছাড়াও ঐ মেয়েটির বিয়ের সময় পাত্রকে কিছু ক্ষতিপূরণ অর্থ দিত। গণিকার বিদেশী প্রার্থীকে তার নির্দিষ্ট মূল্য ছাড়া পাঁচপন বেশি দিতে হত। গণিকা বা রূপজীবী যদি টাকা নেবার পর আপত্তি করে, তাহলে, তার প্রাপ্যের দ্বিগুণ অর্থ তার দণ্ড, আর টাকা নেবার আগে আপত্তি করলে প্রাপ্য থেকে সে বঞ্চিত হত। গণিকার শারীরিক নিরাপত্তার জন্যও নানারকম দণ্ড ছিল, যার পরিমাণ ১০০০ থেকে ৪৮০০০ পন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখি, গণিকাকে প্রকাশ্যে অপমান করার দণ্ড ২৪ পন, শারীরিক অত্যাচার করার দণ্ড ৪৮ পন, কান কেটে নিলে পৌনে বাহান্ন পন দণ্ড ও কারাবাস।

দ্বাদশ শতকের গ্রন্থ 'নন্ময়সুন্দরী কথা'তে দেখি গণিকার আয়ের শতকরা ২৫-৩০ ভাগ ছিল রাষ্ট্রের প্রাপ্য অর্থাৎ রাজস্ব। *Moti Chandra 'The World of Courtesans'* গ্রন্থে লিখেছেন, ইতস্তত খুব উচ্চহারে উপার্জনের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পত্তির— অন্তত স্থাবর সম্পত্তির উপরে তাদের একান্ত অধিকার ছিল না। গণিকা ও তার বিকল্প প্রতিগণিকা মাসিক বৃত্তি পেত সরকার থেকে নিজস্ব উপার্জনের কোনো কোনো অংশে তার অধিকার ছিল, এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে সে দানও করতে পারত। কিন্তু তার মৃত্যুর পরে তার কন্যার অধিকারে মায়ের সম্পত্তি যখন আসত, তখন সেও ঐ জীবন সত্ত্বের আইনে, বন্ধক, বিক্রয়, দায় ও পরিবর্ত এসবে তার অধিকার থাকত না। রাষ্ট্রের বিপদ হলে তার আয়ের অর্ধেকই বাজেয়াপ্ত হতো। গণিকাকে গণিকাত্ব থেকে

মুক্তিদানের ব্যবস্থা ছিল দু'রকমের ঃ— **প্রথমতঃ**- রাজা ইচ্ছা করলে যে কোনো গণিকাকে কুলনারী বলে ঘোষণা করতে পারতেন, তখন সে গণিকাত্বের সামাজিক গ্লানি ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পেত এবং কুলনারীর প্রাপ্য অধিকার ও সম্মান পেত। **দ্বিতীয়ত ঃ**- যেভাবে সে গণিকাত্ব থেকে মুক্তি পেত, তা হল কোনো পুরুষ তাকে বিবাহ করতে চাইলে বা মুক্তি দিতে চাইলে ২৪ হাজার পন গণিকালয়ের কর্ত্রীকে দিলে সে মুক্ত হতো।

গণিকার ভূমিকা সম্পর্কে কামশাস্ত্রে পড়ি যে,— রাজা অথবা ধনী নাগরিকের দলবলের সঙ্গে কাব্য, নাটক, শিল্প ইত্যাদির আলোচনা করা, ধনীর গৃহে অনুষ্ঠিত উৎসব 'গোষ্ঠীতে' অংশগ্রহণ করা। ভিন্ন ভিন্ন বণিক বা ধনী নাগরিকের গৃহে এই 'গোষ্ঠী'র আয়োজন হতো। সেখানে প্রচুর পান-ভোজনের ব্যবস্থা থাকত এবং গণিকাদেরই প্রথম পরিবেশন করা হতো, যেন তারাই প্রধান অতিথি। মাঝে মাঝে সমস্ত দলটাই নগরের বাইরে যেতেন যানবাহনের সাহায্যে, সেখানে অভিনয় দেখতে। গণিকারা ছিল কতকটা অলঙ্করণ, কতকটা মার্জিত বিনোদনের উপকরণ। সেখানে কুলনারীর শিক্ষালাভের ব্যবস্থা ছিল না, সেখানে গণিকার শিক্ষা তালিকা ছিল প্রকাণ্ড। মৃচ্ছকটিকের নায়িকা বসন্তসেনা রূপে ছিল অতুলনীয়, শিক্ষাদীক্ষায়, চরিত্রে, মহানুভবতায় সে ছিল অসামান্য, উজ্জয়িনীর লোকে তাকে 'উজ্জয়িনীর অলঙ্কার স্বরূপিনি ও নগরলক্ষ্মী' আখ্যায় ভূষিত করেছেন।

গণিকাবৃত্তি গুপ্ত পরবর্তী যুগের সমাজে ঠিক যে নীচ কাজ ছিল তা বলা যায় না। গণিকারা নিজেদের আত্মসম্মান বজায় রাখত। সমাজের বিশিষ্ট মানুষদের সঙ্গে তাদের ওঠাবসা ছিল। গুপ্ত পরবর্তী সমাজের তাই উচ্চস্তরের মানুষের কাছে তাই গণিকারা ছিল প্রায় অপরিহার্য।

4.6 পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতকের ভারতবর্ষের ধর্মের রূপান্তর

বৌদ্ধধর্মের ক্রমবির্বতন ঃ বিভিন্ন যানের উদ্ভব ঃ গুপ্ত যুগের মধ্যে মহাযান বৌদ্ধধর্ম ভারতে বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করেছিল। হিউয়েন সাঙ, যিনি সপ্তম শতকে ভারতে এসেছিলেন, তিনি হীনযানকে প্রায় মুমূর্ষু দেখেছিলেন। শুধু পশ্চিম ভারতের কিছু অংশে হীনযান তখনও প্রাণবন্ত অবস্থায় ছিল। হিন্দু ভারতবর্ষে এর ভাগবত আবেদন আর তেমন জোরালো ছিল না। সামগ্রিক বিচারে বৌদ্ধ ধর্মের তখন অবনতি আরম্ভ হয়েছিল। অনেক বড় বড় মঠ তখন ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্রগুলি তখন প্রায় পরিত্যক্ত হয়েছিল। কিন্তু, তবুও ভারতে তখন বৌদ্ধ ধর্মের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। এই ধর্মের সাথে যুক্ত অনেক সন্ন্যাসী এবং বিহার ছিল। এই বিহারগুলির মধ্যে নালন্দাই প্রধান। পাল রাজাদের সময় এই নালন্দাবিহার ছিল। বৌদ্ধধর্ম ও জ্ঞানচর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

সেই সময় উত্তর ভারতে সাংস্কৃতিক মানেরও অবনতি ঘটেছিল। গুপ্তযুগের সমাপ্তির পর থেকে সমবেদী মায়াবিদ্যা এবং যৌন অতীন্দ্রিয়বাদের আদিম ধারণা ভারতীয় ধর্মে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এই ধারণা বৌদ্ধ ধর্মকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এরফলে, তৃতীয় একটি যান, বজ্রযান, অষ্টমশতকে পূর্বভারতে আবির্ভূত হয়ে বঙ্গ দেশ এবং বিহারে দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল। বিহারের অন্তর্গত বিক্রমশীলার বৃহৎ বিহারটি ছিল বজ্রযান বৌদ্ধদের।

মহাযান ধর্ম ইতিহাসের গোড়ার দিকে, এই ধর্মে দেবীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। অন্যতমা দেবী ছিলেন প্রজ্ঞাপারমিতা। তাকে বোধিসত্ত্বের গুণাবলীর মূর্ত রূপ বলা যায়। পরে, হিন্দু ধর্মের দেবতাদের মত বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বদের পত্নী কল্পনা করা হয়েছিল। এই দেবীরাই ছিলেন দেবতাদের প্রকৃত শক্তি। দেবতাকে মনে করা হতো

সুদুর এবং অজ্ঞেয় এবং দেবীকে সক্রিয় মনে করা হত। সুতরাং দেবতাকে পেতে হলে দেবীর সাহায্য নিতে হবে। যৌন মিলনের আদলে স্বর্গীয় সৃষ্টিকার্যকে ভাবা হত। এই সব চিন্তা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যৌন প্রতীক এমন কি ধর্মীয় আচার হিসাবে যৌন মিলন ও হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের কোন কোন শাখায় প্রবেশ করেছিল।

এই ভাবগুলির সঙ্গে এক নূতন মোহিনী অতীন্দ্রিয়বাদ যুক্ত হয়েছিল। হীনযান বিশ্বাস করত যে, আত্মসংযম ও ধ্যানের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে ব্যক্তিত্বলয়ের ফলে মুক্তি অর্জন করা যায়। মহাযানের সঙ্গে নতুন চিন্তা যোগ করেছিল মহাযান বিশ্বাস করত যে বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বের দাক্ষিণ্য এবং সাহায্য মুক্তি অর্জনের সহায়ক। বজ্রযান বিশ্বাস করত যে মোহিনী শক্তি আয়ত্ত করে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। এই শক্তিকে বজ্র বলা হত। তাই বৌদ্ধধর্মের নূতন শাখার নাম হয়েছিল বজ্রযান।

এই নূতন ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রধানা দেবী ছিলেন, বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বদের পত্নী, তারাগণ। এছাড়া মাতঙ্গী, পিশাচী, ডাকিনী, যোগিনী ইত্যাদি তুচ্ছ দেবীরাও ছিল। বজ্রযান বিশ্বাস করত যে, দেবদেবীদের অনুগ্রহ ভিক্ষা করে কোন লাভ নেই। তাদের বাধ্য করতে হবে। যে গ্রন্থাদিতে এ কাজ করার উপায় অর্থাৎ সাধনার কথা ছিল, তাদের বলা হয় তন্ত্র। তাই বজ্রযানকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বলা হয়। এই ধর্মের দুইটি প্রধান উপাদান 'মন্ত্র' এবং 'যন্ত্র'। এই ধর্ম অনুসারে, মন্ত্র যদি সঠিক উচ্চারণ এবং যন্ত্র (মোহিনী প্রতীক) যদি সঠিক অঙ্কন করা যায়, তাহলে পূজারী দেবতাদের তাকে মোহিনী শক্তিদানে বাধ্য করতে পারে। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের মন্ত্রগুলির মধ্যে ''ওম মণিপদ্মে হূম'' সমধিক প্রসিদ্ধ। এখনও তিব্বতে প্রত্যহ অসংখ্যবার এই মন্ত্রের তাৎপর্য হয়ত যৌন। এ হয়ত বুদ্ধ এবং প্রজ্ঞাপারমিতার, বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর এবং তারার যৌন মিলনের ইঙ্গিত বহন করে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, মহাযান বৌদ্ধধর্মে অনেক বোধিসত্ত্বের স্থান ছিল। তাদের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী এবং বজ্রপানি ছিল প্রধান। অবলোকিতেশ্বর তার অনুকম্পার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাই অবলোকিতেশ্বরের মূর্তিতে দেখা যায় যে, তার দৃষ্টি সর্বদা অবনতমুখী এবং পতিতের সাহায্যকল্পে তাঁর হাত দুইটি সর্বদা প্রসারিত। মঞ্জুশ্রী মনে করা হত জ্ঞানের উদ্বোধক। তার এক হাতে থাকত ভ্রান্তি এবং মিথ্যা ছিন্ন করার জন্য উন্মুক্ত তরবারি এবং অন্য হাতে দশটি প্রজ্ঞাপার- মিতার বর্ণনা সম্বলিত একটি গ্রন্থ। বজ্রপানি ছিলেন অপেক্ষাকৃত নির্মম। তিনি পাপ এবং অমঙ্গলের শত্রু। তার হাতে থাকত এই নির্মমতার প্রতীক একটি বজ্র।

তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মে মানসিক অনুশীলনকে অবহেলা করা হয়নি, কিন্তু তার লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়েছিল। অতি প্রাকৃত সমতা লাভ করা এই অনুশীলনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যে অনুশীলন করত, সে নিজেকে এতটা সম্মোহিত করতে পারত যে, সে ভাবত যে তার পিতা বুদ্ধকে হত্যা করে তার স্থান অধিকার করার জন্য তারার গর্ভ থেকে তার পূনর্জন্ম হয়েছে। সে আরও মনে করত যে, কোনো মহিলা ভক্তের সঙ্গে যৌন মিলনের মধ্যে দিয়ে তারা উভয়ে বুদ্ধ এবং তারা, অথবা সে নিজে তারা হতে পারবে। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে যৌন মিলনে কোনো নিষেধবিধি ছিল না। অগম্য গমনেও সেখানে কোনো বাধা ছিল না। কেননা মনে করা হত যে সাধারণ অজ্ঞান মানুষের পক্ষে যা পাপ, যে এই পথের পথিক, তার পক্ষে তা পাপ নয়। মদ্যপান, মাংসাহার, পশুহত্যা, এমনকি নরহত্যাও, এই ধর্মে নিষিদ্ধ ছিল না। কালক্রমে গৌতম প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্ম এইভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল।

কোশাম্বি বৌদ্ধধর্মের অবনতির সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ভারতে তখন ধীরে ধীরে জমিতে মধ্যভূম্যাধিকারী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। এই শ্রেণীর কাছে উদ্যোগী উচ্চবর্ণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ্যধর্ম অধিকতর

সুবিধাজনক মনে হয়েছিল। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উপর এই ধর্মের একচেটিয়া অধিকারের ফলে এ রাষ্ট্রের যোগ্যতর অনুষঙ্গ হতে পেরেছিল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের তুলনায় ব্রাহ্মণগণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং অধিকতর যোগ্যতার সঙ্গে উপজাতিগুলিকে বিভিন্ন বর্ণে পরিণত করতে পারত। যুদ্ধাশ্রয়ী বৃহদায়তন, অতি কেন্দ্রীভূত কিন্তু ব্যক্তিগত শাসনাধীন সাম্রাজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের অবনতি অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। দুইটি প্রতিষ্ঠানই তখন ছিল আর্থিক দিক থেকে অলাভজনক। ধর্ম একদা অশোককে যুদ্ধ থেকে বিরত করেছিল, কিন্তু হর্ষকে তা করতে পারেনি। কোশাম্বি বলেন যে, সামাজিক এবং শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে বৃহৎ বিহারগুলি কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীর সমান্তরাল প্রতিষ্ঠান ছিল।

জৈন ধর্মের বিবর্তন ঃ সাংগঠনিক দিক দিয়ে গুপ্ত যুগে জৈন ধর্মের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এই সময়ের আগেই জৈন ধর্মে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর যে বিভাজন হয় তা চরম আকার ধারণ করে এই সময়ে। ফলে, জৈন সন্ন্যাসীদের সাথে সাথে জৈনধর্মাবলম্বী গৃহীরাও বিভাজিত হয়ে পড়ে। যাপনীয়গণের মতো আপস মনোভাবাপন্ন এক জৈন গোষ্ঠী থাকলেও তারা এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেত না। এই দুটি প্রধান সম্প্রদায় দক্ষিণ ভারতে সঙঘ ও গণের মতো এবং উত্তর ভারতে কুল, শাখা এবং পরবর্তীকালের গচ্ছের মত ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়েছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যবাদের যুগে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরুত্থাণের ফলে বৌদ্ধ ধর্মের মতো জৈন ধর্মেরও অবনতি ঘটে। এ যুগে জৈন ধর্ম সম্পর্কিত লেখও খুব কম ছিল।

গুপ্ত যুগে জৈন ধর্ম দক্ষিণ ভারতে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে ছিল। রাজানুগ্রহ লাভ করায় রাজপরিবারে সদস্য বর্গ, মন্ত্রী, ও ক্ষুদ্র নৃপতিরা এই ধর্মের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলে কান্নাড় ভাষাভাষী অঞ্চলে এই ধর্ম প্রসার লাভ করে। দক্ষিণ ভারতের রাজারা এই ধর্মে দীক্ষিত হন কিনা জানা না গেলেও তারা এই ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা যে করেন, তাতে সন্দেহ নেই।

বাদামীর চালুক্য রাজারা জৈনধর্মের প্রতি আগ্রহী ছিলেন কিনা তা বিশেষ জানা যায় না। কিন্তু চালুক্যরাজ প্রথম পুলকেশী এবং কীর্তিবর্মন যে জৈনদের দান করেছিলেন, তা দুটি লেখ থেকে জানা যায়। কিন্তু, এই লেখ দুটির প্রমাণ কতটা গ্রহণীয়, তা নিয়ে সন্দেহ দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে শৈব এবং বৈষ্ণব সন্তগণের হোড় প্রচার কার্যের ফলে সে ধর্ম রাজানুগ্রহ লাভ করা থেকে বঞ্চিত হয়। আর এই সময় থেকেই দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্মের প্রতিপত্তি কমতে থাকে।

গুপ্ত যুগে জৈন সন্ন্যাসীরা কেবল ধর্মপ্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তারা ধর্মীয় সাহিত্যের সাহায্যকারী গ্রন্থ রচনা করেন। পূর্ববর্তী ছন্দোবদ্ধ টীকা, যা নিযুক্তি নামে খ্যাত, এ যুগে সেগুলিকে নতুন রূপ দেওয়া হয়। এগুলিকে ভাষ্য আকারেও বৃদ্ধি করা হয়। সঙঘদাস, জিনদাস, সিদ্ধসেন নামক জৈন পণ্ডিতরা এ কাজে তৎপর হন। অনুশাসন বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থের টীকা প্রকৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। এ যুগের জৈন পণ্ডিতরা প্রাকৃত ভাষার পরিবর্তে ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। কারণ, একমাত্র সংস্কৃতই ছিল অন্যান্য ধর্ম ও ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে আলাপ আলোচনার একমাত্র মাধ্যম। তাছাড়া, প্রাকৃতের থেকে সংস্কৃত ছিল অনেক বেশি মর্যাদাবান। তাই এই সময় ক্রমেই প্রাচীন প্রকৃত টীকার পরিবর্তে সংস্কৃত টীকার রচনার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এ প্রসঙ্গে জৈনপণ্ডিত হরিভদ্রের নামোল্লেখ করা যায়, যিনি তার বিভিন্ন গ্রন্থ ও টীকা সংস্কৃতে রচনা করেন। দক্ষিণ ভারতের দিগম্বর জৈনরা প্রাকৃত ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করেন। বিখ্যাত দিগম্বর লেখক কুণ্ড কুণ্ড খ্রীষ্টীয় শতকের গোড়ার দিকে প্রাকৃত

ভাষায় তার গ্রন্থ রচনা করেন। গুপ্ত যুগে পালি ভাষার লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, —স্বামী কার্তিকেয়, বট্টকের, যদিবৃষভ প্রমুখ। সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন,— মহাতরঙ্গ, পূজ্যপাদ অকল প্রমুখ। ঐ যুগের জৈনশাস্ত্র ছিল ন্যায়শাস্ত্র নির্ভরশীল।

শৈবধর্মের বিবর্তন ঃ গুপ্ত যুগ হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের যুগ। এই যুগের অধিকাংশ রাজাই ছিলেন বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী। ধর্মীয় দিক থেকে তারা উদারনীতি গ্রহণ করায় বৈষ্ণব ধর্মের মতো শৈবধর্মেরও উন্নতি ঘটে। প্রথম কুমারগুপ্ত নিজে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হলেও তিনি স্কন্দ পূজা করতেন। তিনি স্কন্দের বাহন ময়ূর চিহ্নিত মুদ্রার প্রবর্তন করেন। তিনি নিজ পুত্রের নামও রেখেছিলেন স্কন্দ। শুধু ভারতীয়দের কাছে নয়, বিদেশীদের কাছেও গুপ্তযুগের শৈব ধর্মের জনপ্রিয়তা ছিল। কোনো কোনো কুষাণ রাজার মতো, হুনরাজ মিহিরকুলও শিবের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। বাংলার রাজা শশাঙ্ক, কনৌজের পুষ্যভূতি বংশের কোনো কোনো রাজা, বলভীর মৈত্রক বংশীয় রাজাগণ শৈব ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন।

দক্ষিণ ভারতে এই সময়েই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে শৈব ধর্ম অবস্থান করছিল। আনুমানিক ৬০০-৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্বকারী কাঞ্চীর পল্লববংশীয় নৃপতি প্রথম মহেন্দ্রবর্মন প্রথমে জৈন ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি শৈব সন্ত অপ্পরের প্রভাবে শৈব ধর্মগ্রহণ করেন। তখন থেকেই কাঞ্চ শৈব ধর্মের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। মহেন্দ্রবর্মন রচিত 'মত্তবিলাস প্রহসন' নামক একটি সংস্কৃত ব্যঙ্গ রচনাতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের তীব্র ব্যঙ্গ করা হয়েছে। তবুও দক্ষিণ ভারতের সমস্ত রাজাই যে এমন মনোভাবাপন্ন ছিলেন একথা বলা যায় না। উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে আগত ব্রাহ্মণরা বৈদিক ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হওয়ায়, দক্ষিণ ভারতের রাজারাও সাধারণ ভাবে তাদেরই সমর্থন করতেন। ব্রাহ্মণদের সাথে কেবল বৈদিক সংস্কৃতিই আসেনি, বেদ বিরোধী সংস্কৃতি, ধর্মীয় ক্ষেত্রে বৌদ্ধ, জৈন, ভাগবত এবং পশুপতি। শৈব ধর্মও এসেছিল।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে তামিল অঞ্চলে শৈব ধর্ম বিশেষ প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। একথা জানা যায় বিভিন্ন শৈব সন্ত ও নায়নারদের রচিত স্তোত্র থেকে। এই সমস্ত স্তোত্র রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— অপ্পর, সম্বন্দর, মনিক্কবসগর, সুন্দর প্রমুখ। এরা বৈদিক দেবতাদের অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করতেন। দেবতার ওপর গুরুত্ব আরোপ না করে মানুষের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর তারা বেশি গুরুত্ব দেন। তাদের কাছে প্রেম ও শিব আলাদা নয়। তারা মনে করতেন, প্রেমের পরিণতি হল শিব। এই স্তোত্র রচয়িতাদের মধ্যে কয়েকজন ব্রাহ্মণ ছাড়া বাকী সকলেই ছিল নিম্নবর্ণের। অনেকে তামিল অঞ্চলের এই ভক্তিবাদী ধর্মকে এই অঞ্চলে আর্যায়নের বিরুদ্ধে আংশিক প্রতিরোধ বলে মনে করেন। ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃত ভাষায় হিন্দুধর্ম প্রচার করতেন, যা সকলের বোধগম্য ছিল না। অন্যদিকে, ভক্তিবাদী ধর্ম প্রচারকরা স্থানীয়, সাধারণের বোধগম্য তামিল ভাষায় ধর্ম প্রচার করতেন।

গুপ্ত যুগ এবং পরবর্তী গুপ্ত যুগের শিবলিঙ্গগুলি পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বাস্তব এবং প্রথাগত ছিল। প্রথম কুমারগুপ্তের সময়ের করমদাঁড়া শিবলিঙ্গই তার প্রমাণ। তবে, সবক্ষেত্রেই বাস্তব বিষয়টিকে বর্জন করা হয়েছিল এমন নয়। ভিটায় প্রাপ্ত কয়েকটি সীল বাস্তবতার নিদর্শন বহন করে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকে শিবের দুই ধরনের বিশেষ মূর্তির লিঙ্গোদ্ভব এবং মুখ লিঙ্গের নিদর্শন পাওয়া যায়। লিঙ্গোদ্ভব মূর্তিগুলিতে সম্প্রদায়গত ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। এই ধরনের মূর্তি পাওয়া গেছে মহারাষ্ট্রের ইলোরার দশাবতার গুহায়।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বাখর গঞ্জ জেলার লক্ষ্মণকাটি গ্রামে একটি গরুড়াসন বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। অনেকে এটিকে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের রচনা বলে মনে করেন। মথুরা মিউজিয়াম-এ একটি যোগাসন বিষ্ণুমূর্তি রক্ষিত আছে। উত্তর ভারতে বিষ্ণুর শায়ন মূর্তি খুবই বিরল। তুলনায় দক্ষিণ ভারতের বিষ্ণু মন্দিরগুলিতে এর সংখ্যা অনেক বেশি।

ভক্তিবাদ ঃ মধ্যযুগের ধর্ম আন্দোলনের সাথে যুক্ত সাধু সন্ন্যাসীরা ঈশ্বর সাধনার জন্য যে পথ বেছে নেন, তা ভক্তি মার্গ নামে খ্যাত। এ কারণে ভক্তি আন্দোলন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। মুসলিমদের নেতৃত্বে পরিচালিত সুফী আন্দোলনের মতো হিন্দুরাও ভক্তি আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন।

ভক্তিবাদ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। ভক্তিবাদের উত্থান কিভাবে ঘটেছে? হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক বিবর্তন নাকি অন্যান্য ধর্মমতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ধর্মসংস্কারকরা ভক্তিবাদ প্রচার করেছেন? এ প্রসঙ্গে প্রথমেই "Glimpses of Medieval Indian Culture"-এর লেখক ইউসুফ হুসেন-এর কথা বলা যায়, যিনি বলেন, —ইসলাম ধর্মের নীতি ও আদর্শই ভক্তিবাদী আন্দোলনের প্রেরণা। তিনি মনে করেন, —"মধ্যযুগ অতীন্দ্রিয়বাদের প্রধান ও প্রথম প্রবক্তা রামানন্দ ইসলামের আদর্শ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং সম্ভবত তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভক্তিবাদ প্রচার করেছিলেন।" অধ্যাপক হুসেন আরও বিশ্বাস করেন যে, —'ভক্তিমার্গ' ভারতীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত। কিন্তু মধ্যযুগের ভক্তিবাদ সম্পূর্ণ আলাদা। এর সাথে প্রাচীন ধর্মভাবনার মিল পাওয়া যায় না। এই সময়ের ভক্তিবাদ হল ইসলাম ধর্মের ফল। এই ভক্তিবাদে 'বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সাম্য'র কথা বলা হয়েছে।

অধ্যাপক হুসেনের মতে, মধ্যযুগীয় ভক্তি আন্দোলন দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়টি হল শ্রীমৎভগবদগীতার সময় থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী এবং দ্বিতীয় পর্যায়টি হল— ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতক। প্রথম পর্যায়ে, মুষ্টিমেয় একেশ্বরবাদীদের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের ধর্মভাবনার মেলবন্ধন ঘটে। ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ কর তারমধ্যে দিয়ে তারা মুক্তির পথ খোঁজেন রোমিলা থাপার মনে করেন,—ভক্তি আন্দোলনের প্রবক্তাদের ওপর সুফীদের শিক্ষার প্রভাব বিশেষভাবে পড়েছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ডঃ এ. এল. শ্রীবাস্তব এই মতের বিরোধিতা করেছেন। ডঃ মজুমদারের ভাষায়, —"Neither the theory of Islam, nor its practice as regards the Hindus, could appeal to the later as bringing a new message of equality of man.

কোনো কোনো ঐতিহাসিক মধ্যযুগের ভক্তিবাদের প্রসারে ইসলামের পরোক্ষ প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রসার এবং বহু হিন্দুর ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনা হিন্দু ধর্মের সামনে এক সংকট সৃষ্টি করেছিল। এই অবস্থায় হিন্দু সংস্কারকদের একাংশ হিন্দু ধর্মের ভাবাদর্শের মধ্যেই সর্বজনগ্রাহ্য ও সহজ বোধগম্য ধর্ম ভাবনা খুঁজে বের করতে প্রয়াসী হন এবং এরাই ভক্তিবাদের বিকাশে ইসলামের এইরকম পরোক্ষ অবদানের কথা স্বীকার করে নিলেও স্মরণে রাখা দরকার যে, ভক্তিবাদের তত্ত্ব হিন্দু ধর্মাদর্শের মৌলিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল, অন্য কোনো ধর্মের আদর্শকে ভিত্তি করে নয়। এই বিচারে, ভক্তিবাদের ওপর সুফীবাদের ব্যাখ্যা অস্বীকার করা যায় না। দশম শতকে সুফীরা পারস্যের জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ক্রমে ভারতেও সুফী সাধকদের উত্থান ঘটে।

সুফীবাদ ও ভক্তিবাদ উভয় আন্দোলনের প্রেক্ষাপট প্রায় একই রকম ছিল। বস্তুত বৈদিক হিন্দু ধর্মের মধ্যেই ভক্তিবাদের তত্ত্ব নিহিত ছিল। বেদের ব্রহ্মাকেই সৃষ্টির সূত্র এবং আনন্দের উৎস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম ও

জৈন ধর্ম, জাতিভেদ প্রথা অস্বীকার করা হয়েছে এবং স্থানীয় ভাষায় প্রচার করা হয়েছে ধর্মের বাণী। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে মুক্তির পথ হিসাবে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে ভক্তিবাদ দক্ষিণ ভারতে প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা লাভ করে। দক্ষিণ ভারত থেকে ভক্তিবাদের ঢেউ উত্তর ভারতে আছড়ে পড়ে। তবে এ জন্য অপেক্ষা করতে হয় ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত। কারণ, নায়নার ও আলভার সম্প্রদায় তামিল ভাষায় তাদের মতামত প্রচার করায়, তাদের ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছিল।

সুফীবাদ ও ভক্তিবাদ ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে যে মেলবন্ধন ঘটিয়ে ছিল, আদি মধ্যযুগ ও মধ্যযুগের সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসে তার গুরুত্ব অপরিসীম।

সুফীবাদ ঃ ইসলামের আবির্ভাবের পর বিজিত অঞ্চলের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছিল। ইসলামের ওপর ইরানীয়, গ্রেকো, বাইজানটাইন এবং ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব পড়েছিল। আল-কিন্দি ভারতের ধর্মগুলির ওপর গ্রন্থ রচনা করেন। আল আদিম, আল আসারি এবং আল শাহরাস্তানি ভারতের ধর্ম ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন। আলবিরুনী পতঞ্জলীর যোগসূত্রের আরবী অনুবাদ করেন। খলিফা তন্ত্রের পতনের পর, তুর্কীদের উত্থান ঘটলে চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ইসলামী শাস্ত্র চিন্তায় চুক্তিবাদী মুতাজিলাদের প্রাধান্যের অবসান ঘটে। গোঁড়া রক্ষণশীলরা কোরান ও হাদিসকে কেন্দ্র করে নতুন মতবাদ গঠন করেন এবং তৃতীয় ধারা রহস্যবাদী সুফী মতবাদ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।

মনসুর সুফীতত্ত্বের মূলনীতির প্রতিষ্ঠা করেন। সব ধর্মের অতীন্দ্রিয় অনুভূতির পরিণতিই হল এক ধরনের। মনসুর ঘোষণা করেন যে,— ''আমিই সত্য/ঈশ্বর''। অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়া হল সুফী ধর্মমতের মূল লক্ষ্য। সুফীদের আচার আচরণ ও মঠ জীবনের ওপর বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান মঠ জীবনবাদের প্রভাব পড়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। পেশোয়ারের নাথপন্থী যোগীদের কাছ থেকে সুফীরা হঠযোগ শিক্ষা করেছিল। হঠযোগের ওপর সংস্কৃতে লেখা গ্রন্থ 'অমৃতকুণ্ড' আরবী ও ফারসীতে অনুদিত হয়। সুলতানী যুগের প্রথম দিক থেকে ভারতবর্ষে দুটি সুফী সিলসিলা প্রাধান্য অর্জন করেছিল। এ দুটি হল চিশতি ও সুরাবর্দী।

ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর সুফী আন্দোলন গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারা এদেশের অবহেলিত, লাঞ্ছিত মানুষদের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সুফীরা ন্যায়, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও মানবতাবাদের উচ্চ আদর্শ তুলে ধরেছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে তারা মিলনের দূত হিসাবে কাজ করেছিলেন। হিন্দুদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য লাভের জন্য সুফী দরবেশরা হিন্দুদের অনেক আচার আচরণ গ্রহণ করেছিলেন। সুফী আন্দোলন ভারতে এক সহনশীল, উদার ও মানবতাবাদী পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। সুফী সন্তরা রাজশক্তি ও শাসক গোষ্ঠী থেকে সাধারণত দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। কে. এম. আশরফ লিখেছেন যে,— ইসলামের জন্ম লগ্ন থেকে সে অস্থির গতি ও প্রচণ্ড আবেগ তৈরি হয়েছিল, তারই এক প্রকাশ হল সুফীবাদ। সুফীবাদের ওপর জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু দর্শনের প্রভাব পড়েছিল। ঈশ্বর সাধনা, মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও অহিংসা হল এর মৌল উপাদান। সুফীবাদ কোরান ও হাদিস থেকে অনেক ক্ষেত্রে সরে গিয়েছিল। বাস্তব পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের খাতিরে নতুন ধর্ম মত গড়ে উঠেছিল। ভারতীয় যোগ ও সন্ন্যাস একে প্রভাবিত করেছিল। হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়, এবং দুই সংস্কৃতির মিলনে এদের বিশিষ্ট অবদান ছিল।

4.7 স্থাপত্য ও শিল্পকলা

পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে ভারতবর্ষের শিল্পকলায় এক নতুন দিগন্তের উন্মেষ হয়েছিল। শিল্প স্থাপত্যের শৈলীগুলি আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে লক্ষণীয়। বাংলায় রেখ রীতি অনুযায়ী নির্মিত মন্দিরগুলি স্থাপত্য শৈলীর দিক থেকে উত্তর ভারত ও উড়িষ্যার নগর শৈলীর মধ্যে অনেকাংশে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গত বলা যায়, প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগীয় বাংলায় পাথর ও ইঁটের তৈরি বেশ কয়েকটি রেখ দেউলের নিদর্শন পাওয়া গেছে। বাংলায় রেখ বা শিখর ধরনের মন্দিরগুলি ক্রমশ বিবর্তিত হয়েছিল। দশম শতককে বাংলা প্রতিমা শিল্পের সুবর্ণ যুগ আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। নবম শতকীয় মূর্তিগুলিতে যে মাংসল শৈথিল্য বিদ্যমান ছিল দশম শতকে তাতে পরিবর্তন ঘটেছে। এগুলির শিথিল মাংসল দেহে চারিত্রিক দৃঢ়তা ও শক্তির আর্বিভাব লক্ষনীয়।

নাগররীতির অনুসরণে মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সমূহের বিকাশ লক্ষ্য করা যায় উড়িষ্যায়। সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সময়কালে উড়িষ্যার বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য মন্দির নির্মিত হয়েছিল। উড়িষ্যার মন্দিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল মুখ-মণ্ডপ বা জগমোহন। এগুলি পীর দেউল নামে পরিচিত। নাগর রীতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল শিখর। গুপ্তোত্তর যুগের মন্দিরগুলিতে এগুলি স্পষ্টভাবে লক্ষণীয়।

মধ্যভারতীয় মন্দিরের ভূমি পরিকল্পনায় 'সপ্তরথ' ধারণা থাকলেও খাজুরাহের মহাদেবের মন্দিরে পঞ্চরথের ধারণাটি প্রকটিত হয়েছে। এখানকার মন্দিরে চতুষ্কোণরীতি ত্যাগ করে আয়তক্ষেত্রের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। নাগরশৈলীর প্রভাবযুক্ত উত্তর ভারতীয় মন্দিরগুলির ন্যায় খাজুরাহো মন্দিরগুলির শিখর বক্ররেখাসম্পন্ন।

দ্রাবিড় শৈলী অবলম্বনে রাষ্ট্রকূট শাসনাধীনে নির্মিত সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ ধরনের মন্দির হল ইলোরার কৈলাসনাথ মন্দির দ্রাবিড় স্থাপত্য শৈলীর চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই মন্দিরে পরিচালিত হয়। এগুলি হল— '*মণ্ডপ*', '*নন্দীমণ্ডপ*', ও '*গোপুরম্*'। চোল আমলে দক্ষিণ ভারতে ব্রোঞ্জ ধাতব শিল্পে উন্নতি হয়। এর সব থেকে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল নৃত্যরত নটরাজ মূর্তি।

ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে অষ্টম ও নবম শতকে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা লক্ষণীয়। ভারতের ভাস্কর্য নিদর্শনগুলি ছিল ত্রিমাত্রিক এবং চিত্রকলাগুলি ছিল দ্বিমাত্রিক। অজন্তা ও ইলোরার গুহাগুলির ক্ষেত্রে এর নিদর্শন আছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে অষ্টধাতুর মূর্তি নির্মিত হয়েছে। নালন্দার মূর্তিগুলি উল্লেখের দাবি রাখে।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে ভারতীয় স্থাপত্যের সঙ্গে পারসিক স্থাপত্যের সংমিশ্রণ আমাদের চোখে পড়ে। এরই ফলস্বরূপ, ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্যের বিকাশ ঘটে।

4.8 পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতকের আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তন

আদি মধ্য যুগে অর্থাৎ গুপ্ত এবং পরবর্তী আমলে ভারতীয় সাংস্কৃতিক জগৎকে প্রভাবিত করেছিল আঞ্চলিক ধারণা। ভাষা ও সাহিত্যে এই আঞ্চলিক ধারণার প্রভাব লক্ষণীয়। আঞ্চলিক ভাষাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— বাংলা, গুজরাটি, মারাঠী, তামিল, কানাড়া ও তেলেগু। পূর্ব-পশ্চিম-দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ এলাকাতেই আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ঘটে।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি সংক্রান্ত নানা মুনির নানা মত পাওয়া যায়। '*বাঙালীর ইতিহাস— আদি পর্ব*' গ্রন্থে অধ্যাপক *নীহার রঞ্জন রায়* বিস্তারিত ভাবে এর আলোচনা করেছেন। *আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের* সুনিশ্চিত অভিমত হল, —বাংলা ভাষার আদি যুগ তথা এর প্রথম গঠনমূলক কাল হল আনুমানিক ৯৫০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দ। *রমেশচন্দ্র মজুমদার* মনে করেন, —খ্রীষ্ট্রীয় অষ্টম শতাব্দীতে পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতভাবে বাঙালি জাতি এবং বাংলা ভাষার সংস্কৃতির বির্বতনে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা ঘটিয়েছিল। নীহার রঞ্জন রায় যথার্থ লিখেছেন যে, বাংলা ভাষায় লেখা চর্যাগীতগুলি মাগধী অপভ্রংশে গৌড় বঙ্গীয় রূপের সহজ ও স্বাভাবিক বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও পরবর্তীকালে তার অনুগামীরা দেখিয়েছেন যে, চর্যাগীতিগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে প্রাচীন বাংলা ভাষা। সেন আমলের খ্যাতনামা কবি জয়দেবের 'গীতিগোবিন্দ' কাব্যে (সংস্কৃত ভাষায়) এমন ২৪টি গান লিপিবদ্ধ আছে, সেগুলির সঙ্গে কোনো লোকায়ত, স্থানীয় ভাষার নিবিড় সংযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় কিছুটা আলোকপাত করেছেন। তাঁর অনুকরণে নীহার রঞ্জন রায় দেখিয়েছেন যে, সংস্কৃত ভাষায় রীতি হওয়া সত্ত্বেও গীতগোবিন্দ কাব্যে ব্যবহৃত ছন্দ-রীতি ও প্রকরণের মধ্যে যে প্রাচীনতম বাংলা ভাষার অথবা বঙ্গদেশে প্রচলিত শৌরসেনী অপভ্রংশের কিছুটা প্রভাব অনুমিত হয়।

চর্যাগীতি ও দোহাগুলি ছাড়াও আদি মধ্যকালীন পর্বে বাংলা ভাষার নমুনা অন্যান্য কিছু সূত্রেও বিধৃত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে কল্যাণের চালুক্যরাজ তৃতীয় সৌমেশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতায় ১১২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'মানসোল্লাস' নামে সংস্কৃত কোষগ্রন্থটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থটির গীতবিনোদ অংশে প্রাচীনতম বাংলায় রচিত কয়েকটি গানের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার এবং গোপীদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা এ গানগুলির বিষয়বস্তু। নীহার রঞ্জন রায় জোরের সঙ্গেই বলেছেন যে,— এই বাংলা গানগুলি বঙ্গদেশেই রচিত হয়েছিল এবং মহারাষ্ট্র পর্যন্ত তার প্রসার ঘটেছিল। চালুক্যরাজ তৃতীয় সোমেশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত 'মানসোল্লাস' গ্রন্থে ঐ গানগুলির উল্লেখ একথাই প্রমাণ করে।

আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে গুজরাটির উদ্ভব কখন হয়েছিল এ বিষয়ে অনেক বিতর্ক আছে। প্রসঙ্গত বলা যায়, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষে উদ্দোতন সুরীর লেখা জৈন গ্রন্থ 'কুবলয়মালা'য় (৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) মধ্যদেশে সিন্ধু, মেরু, মালব, লাট প্রভৃতি অঞ্চলের সাথে গুর্জর দেশের বণিকদের ও পৃথক ভাষা ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। *এইচ. সি. ভায়ানি* মনে করেন যে,— হাজার খ্রীষ্টাব্দের আগে আধুনিক গুজরাটি ভাষার জন্ম হয়নি। গুজরাটি ভাষায় রচিত কাব্য বা কবিতাগুলিতে জৈনধর্ম, জৈন তীর্থঙ্করদের কাহিনী এবং ঐ ধর্মের কিছু দিক প্রতিফলিত হয়েছিল। পালহনর 'নেমী-রাজুল-বারহমাসা' (১২৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) এবং বিনয়চন্দ্রের 'নেমীনাথ-চতুষ্পদীকা' (১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে) গুজরাটি ভাষায় এই দুটি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে গুজরাটির আবির্ভাব ঘটেছিল প্রায় বাংলা ভাষা উদ্ভবের সমসাময়িক কালে। বাংলা ভাষার সাথে যেমন শৌরসেনী ও মাগধী প্রাকৃতের যোগ ছিল, তেমনি গুজরাটি ভাষার সাথে যোগ ছিল অপভ্রংশ ভাষা ও সাহিত্যের।

মারাঠী সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন *মুকুন্দরাজ*, যাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে। ১১৯০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল দর্শন শাস্ত্রের ওপর তাঁর গ্রন্থ '*বিবেক সিন্ধু*'। খ্রীষ্টীয় দশম শতকের শেষ দিকে উৎকীর্ণ চামুন্ডরাজ এর শ্রবণবেলগোলা লেখতে একটি মারাঠী বাক্যের উল্লেখ আছে। এছাড়া দ্বাদশ শতকের

প্রথম দিকে লেখা কল্যাণীর চালুক্য রাজ তৃতীয় সোমেশ্বরের 'মানসোল্লাস' গ্রন্থে মারাঠী ভাষায় লেখা একটি গানের উদ্ধৃতি আছে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের মধ্য ভাগে হিন্দু দর্শনের একটি সংস্কারপন্থী সম্প্রদায় মহানুভবের উদ্ভব ঘটেছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চক্রধর। তিনি জন্মসূত্রে গুজরাটের মানুষ হলেও মারাঠী ভাষায় তার আদর্শ ও ধর্ম মতের প্রচার ঘটান। কাজেই দেখা যাচ্ছে, দশম শতকের আগে আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে মারাঠী ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেনি। দশম-ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কবি ও সন্তদের আগ্রহে এর বিকাশের পথকে প্রশস্ত করে। মহারাষ্ট্রের ভক্তি আন্দোলনে মারাঠী ভাষাকে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং ক্রমশ ঐ ভাষা বিকশিত হতে শুরু করে।

দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন সাহিত্য ভাষা ছিল তামিল। এফ. ডবলু. টমাস লিখেছেন, সংস্কৃত ভাষার পরেই সর্বাধিক ভারতীয় সাহিত্য রচিত হয়েছে তামিল ভাষায়। সঙ্গম সাহিত্যের উল্লেখ আমরা খ্রীষ্ট পূর্ববর্তী সময় থেকেই পাই। তামিল মহাকাব্য 'সলপ্পাদিকরণ' ও 'মণিমেকলই' ছিল দুটি তামিল মহাকাব্য, এই দুটি গ্রন্থের রচনাকাল সম্পর্কে বিতর্ক থাকলেও অধ্যাপক *রামশরণ শর্মা* মনে করেন, —এই দুটি গ্রন্থের রচনাকাল হল খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম-নবম শতাব্দীর মধ্যে। আদি মধ্যযুগে তামিল সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল দিকের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় শৈবসন্তদের ভক্তি স্তোত্রগুলির মধ্যে। *এ. এল. ব্যাসাম* মনে করেন,— ধর্মীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখাগুলির মধ্যে এগুলি অন্যতম।

কানাড়া ভাষার উৎপত্তির আনুমানিক সময়কাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের *চিকমগলুর লেখ* এবং কিছু কাল আগের *শ্রবণবেলগোলা লেখতে* কানাড়া ভাষা ও সাহিত্যের উল্লেখ আছে। এই ভাষায় সাহিত্য রচনায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন প্রভাবশালী জৈনরা। কানাড়ী ভাষায় প্রথম গ্রন্থ *'বোদ্দ আরাধনা'* খুব সম্ভবত ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের আগে রচিত হয়েছিল। বস্তুত পক্ষে, কানাড়া সাহিত্যের মহান অধ্যায় শুরু হয় দশম শতকে। প্রথম নাগবর্মন '*ছন্দমগুধী' লেখেন*। *পম্প* ৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ *'আদি পুরান'* এবং *'বিক্রমার্জুন বিজয়'* নামে দুটি কবিতা লেখেন। পম্প, পোন্ন ও রন্ন-র জৈন ধর্ম ভিত্তিক কানাড়া ভাষায় রচিত সাহিত্যিক ধারা খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকেও বহমান ছিল।

তেলেগু ভাষার বিকাশ লক্ষ্য করা যায় খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষের দিক থেকে। বেঙ্গীর চালুক্যরাজ রাজরাজ নরেন্দ্রর প্রেরণা ও পরামর্শে নন্নিয় তেলেগু ভাষায় মহাভারতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মহাভারত ছাড়াও দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে সংস্কৃত সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কিছু কাব্য তেলেগু ভাষায় অনুবাদের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

পাল-সেন আমলে সংস্কৃত সাহিত্য রচনায় গৌড়ীয় রীতির প্রয়োগ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। গৌড়ীয় রীতির প্রধান লক্ষণ হল— অর্থডম্বর এবং অলঙ্কার ডম্বর। দণ্ডী তাঁর *'কাব্যাদর্শ'* গ্রন্থে স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, গৌড় জনেরা অতি উচ্চকথন এবং অলঙ্কার ও আড়ম্বর প্রিয় ছিল। এই রীতি পুরোপুরিভাবে বিকশিত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় দশম এবং একাদশ শতকে। দশম শতকের কবি রাজশেখর তাঁর *'কাব্য মীমাংসা'* গ্রন্থে এই রীতির উল্লেখ করেছেন, বস্তুতপক্ষে দশম একাদশ শতকে বঙ্গদেশে যে সব বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য তথা সংস্কৃত সাহিত্য রচিত হয়েছিল, যেগুলি মূলত গৌড়ীয় রীতিকে অবলম্বন করেই লেখা হয়। সংস্কৃত ভাষায় রচিত পাল আমলের সব থেকে গুরুত্ব পূর্ণ গ্রন্থ

হল— *সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত'*। তবে, *জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'* ছিল সেন আমলের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যের নিদর্শন। বর্ণনা বিবৃতি, কথোপকথন এবং গীত এই তিনটি এক সাথে একই সাহিত্যরূপের মধ্যে সমন্বিত হয়েছে গীতগোবিন্দে। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত হয় কাশ্মীরি কবি *কলহন*-এর '*রাজতরঙ্গিনী*'। আলংকারিক চাতুর্য প্রদর্শনের যুগে আর্বিভূত হয়েও তিনি স্বাতন্ত্রের সাক্ষ্য রেখেছিলেন। তাঁর লেখার মধ্যে স্বদেশ প্রেম লক্ষণীয়।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রে এক পরিবর্তনের সূচনা হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে জাতি ব্যবস্থা আরও দৃঢ় হয়। বিভিন্ন নতুন জাতির উদ্ভব হয়। গুপ্তদের অর্থনৈতিক নীতি আদি মধ্যযুগে উদ্ভব ঘটায় সামন্ত ব্যবস্থার এবং এর থেকে আসে আঞ্চলিকতা। সমাজে নারীদের ওপর পুরুষদের আধিপত্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, শৈব ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্মে বিবর্তন দেখা যায়। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে অসে ভক্তিবাদ ও সুফীবাদ। গুপ্ত পরবর্তী যুগে যে আঞ্চলিকতাবাদের উদ্ভব হয় তার প্রভাব ভাষা ও সাহিত্যের ওপর পড়েছিল। অর্থাৎ ভাষা ও সাহিত্যেও আঞ্চলিকতা এসেছিল এবং আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ শুরু হয়েছিল। এভাবে বিভিন্ন বিবর্তন ও পরিবর্তন ভারতবর্ষকে গুপ্ত পরবর্তী যুগে এক নতুন যুগের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

4.9 প্রশ্নাবলী

১। অগ্রহার ব্যবস্থা বলতে কি বোঝ? এই ব্যবস্থার উদ্ভবের কারণগুলি নির্দেশ করুন।

২। পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন লক্ষণীয়?

৩। পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ের সমাজ ব্যবস্থা কেমন ছিল? সমাজে নারীর অবস্থা বর্ণনা করুন।

৪। বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন ও নানা যানের উদ্ভব সম্পর্কে বিশ্লেষণ করুন।

৫। ইন্দো-ইসলামিক সংস্কৃতির মেলবন্ধনে সুফীবাদ ও ভক্তিবাদ কতটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল?

৬। পঞ্চম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষের ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ বর্ণনা করুন।

৭। পঞ্চম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষের স্থাপত্য ও শিল্পকলার বিবরণ দিন।

4.10 গ্রন্থপঞ্জী

1. Brajadulal Chattopadhyay— The Making of Early Medieval India.
2. Ram Saran Sharma — Indian Feudalism.
3. Ranabir Chakrabarti— Trade and Traders in Early Indian Society.

4. K. A. Nilakanta Shastri — History of South India.

5. Richard Eaton — Rise of Islam in Bengal Frontier.

6. নীহাররঞ্জন রায়— বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব।

7. A. L. Basham— The Wonder that was India.

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠ্যক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠ্যক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

ড. সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়
উপাচার্য